কেমন করে মানুষ চিনবেন

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৪/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

KEMAN KORE MANUSH CHINBEN
By Partha Chattapadhaya

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৫৬

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর ঃ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ঃ দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স

৩২, বিডন রো, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

মানুষ চিনতে যে সব মানুষেরা
আমায় সাহায্য করেছেন
তাঁদের

একজন খারাপ লোককে সহজে চেনা যায়
কিন্তু একজন ভাল লোককে
সারাজীবনেও চেনা যায় না ঃ

সফোক্লিশ

এই লেখকের অন্যান্য বই

হতাশ হবেন না ১ম খণ্ড
হতাশ হবেন না ২য় খণ্ড
হতাশ হবেন না ৩য় খণ্ড
স্বনির্বাচিত সরস গল্প
বাজপাখির চোখ
ভুত অদ্ভুত

॥ এক ॥
কেমন করে মানুষ' চিনবেন

আসুন, পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হলেন বিখ্যাত নেতা সতীকান্ত বাবু। ময়দানে ওঁর বক্তৃতা শুনে পাগল হননি, এমন অনেক কম মানুষই আছেন। দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, মানবাধিকার লংঘন, পরমাণু বোমা ফোটানো, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, বহুজাতিকদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সতীকান্ত সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠ। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও মূর্তিমান বিদ্রোহ। যুবকের মত তাঁর কণ্ঠস্বর। তরুণের মত বাচনভংগি, শিশুর মত তিনি ক্ষিপ্র।

ইনি হলেন, তণিমা সান্যাল ব্যস্ত এগজিকিউটিভ। ববড চুল, দীঘাঙ্গী, মেদহীন অনন্ত যৌবনা এই উত্তর চল্লিশ নারী সদা হাস্যময়ী, ব্রীড়াব্রতী, অথচ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন প্রতিটি শব্দ। ইংরাজি বলেন মাতৃভাষার মত। তণিমা ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম হয়েছিলেন। বাবা ছিলেন একজন আই এ এস। বিষয় হয়েছে এক বনেদী পরিবারে। স্বামীদের বিরাট ব্যবসা। কিন্তু স্বাধীনচেতা তণিমা বিয়ের আগের চাকরি ছাড়েননি। এক বহু জাতিক প্রতিষ্ঠানের কলকাতা শাখা অফিসের দুহাজার কর্মী তাঁকে ছাড়া নিজেদের ভাবতেই পারেননা। তিনি জনসোংযোগ সম্পর্কে একজন অথরিটি। প্রায়ই পি আর ওদের সভায় বক্তৃতা দেন। তাঁদের শেখান কীভাবে জনসাধারণের কাছে আরও বেশি কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে।

অধ্যাপক অনিলবরণ রায় একদা উপাচার্যও হয়েছিলেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। চার-পাঁচটা বিদেশী ডিগ্রি তার পকেটে। বলেনও খুব ভাল। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি সমাদৃত। সুবিমল নামী একজন লেখক। পরোপকারি। নিরহংকার। কিন্তু তিনি বেশি কথাবার্তা বলা পছন্দ করেন না। প্রগলভতা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। পছন্দমত বন্ধুবান্ধব পেলে আড্ডা দেন। অন্য সময় গম্ভীর।

কিন্তু লোকের কাছে এঁদের যা ইমেজ অন্তরঙ্গদের কাছে ঠিক তার উলটো।

সতীকান্তবাবু, যাঁকে দেখার জন্য যাঁর ভাষণ শোনার জন্য মাঠময়দান ভরে যায়, তাঁর বাড়ির কাজের লোক মোক্ষদা তাঁকে 'অমানুষ' বলে ভাবে। মোক্ষদা তাঁদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করছে তিন বছর। সতীকান্তবাবুর বউ অর্থাৎ গিন্নিমা যিনি আবার একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী তিনি মোক্ষদার সঙ্গে খিটিমিটি করেন। মোক্ষদার কাজ তাঁর পছন্দ হয় না। মোক্ষদা বড় নোংরাটে। ভাল করে বাসন মাজেনা। ময়লা থেকে যায়। তাছাড়া মাসে দুতিন দিন কামাই করে। কামাই করলেই তিনি হিসেব করে পয়সা কাটেন। তিনবছরে মোক্ষদার মাইনে বেড়েছে একবার। উপরন্তু মোক্ষদাকে ভয় দেখানো হয়েছে চাকরি ছেড়ে দিলে পুলিশ দিয়ে

হুজ্জোতি করা হবে। তখন টেরটি পাবে। মোক্ষদার মেয়ের বিয়ের জন্য সতীনাথের কাছে হাজার খানেক টাকা চেয়েছিল মোক্ষদা। সতীনাথ বলেছেন, টাকা কি গাছে ফলে ! মেহনত করে রোজগার করতে হয়। গরিব মানুষেরা বিয়ে-থা উৎসবে অযথা টাকা নষ্ট করে এজন্যই তাদের এত কষ্ট। এই বলে একশ টাকা মোক্ষদাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মোক্ষদার ভাষায় ঃ ছোট মুখে বড় কথা বলতি নেই, তবু না বলে থাকতে পারতিছিনে দাদাবাবু, বাবু আর বউদি, যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী দুই পিশেচ। ইদিকে ছেলেটাতো বখে যাচ্ছিল। বাবু প্রচুর টাকা দে ঠিকেদারি ব্যবসাতে লাগিয়ে দেছে। ছেলেও বাপের গুণ পেয়েছে।

তণিমা স্যান্যাল অফিসে জনপ্রিয়। জনপ্রিয় সোসাইটিতে। তিনি একটি বিখ্যাত ক্লাবের পক্ষ থেকে 'উওম্যান অব দ্য ইয়ার' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ব্রোঞ্জের জোয়ান অব আর্কের স্মারক হাতে তার ছবি আপনারা ইংরাজি দৈনিক গুলিতে দেখে থাকবেন।

তনিমা সান্যাল

কিন্তু যাঁরা তাঁর ওই সম্মানে খুশি হতে পারেননি, তাঁরা তাঁর ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী। পঁচজন মহিলা ও চারজন পুরুষকে নিয়ে নজনের বিভাগ। এদের মধ্যে দুজন বশম্বদকে নিয়ে তণিমা ডিপার্টমেন্ট চালান। তিনি নিজে কিছুই দেখেন না, এই দুজন যা বলেন, তাতেই তিনি সায় দেন। বাকিদের সঙ্গে তিনি আয়রন লেডির মতই ব্যবহার করেন। কারণে অকারণে অপমান করেন তাদের। তাঁর পরের সিনিয়রিটির লোক যাতে কখনই তাঁকে ছাপিয়ে না যেতে পারে তার জন্য তাঁকে বসিয়ে রেখে দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁর একটি জনান্তিক মন্তব্যের জের ধরে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছেন।

অধ্যাপক অনিলবরণ রায় জ্ঞানী গুণি ও যোগ্য ব্যক্তি। যোগ্যতার পুরস্কার পেয়েছিলেন বহুবার। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন। কিন্তু কোথাও ছ

থেকে আট মাসের বেশি টিঁকতে পারেননি। এর কারণ হিসাবে তাঁর সহকর্মীরা বলেন, তিনি মুখের ওপর ক্যাট ক্যাট করে কথা বলেন। কাউকে পরোয়া করেন না। ইউনিয়নের সঙ্গে সদ্ভাব রাখেননি। শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারটাকে তিনি বেতন বৃদ্ধির ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। এর ফলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে তিনি চারপাঁচজনকে সাসপেন্ড করেন। এজন্য তাঁকে সহকর্মীরা কেউ পছন্দ করেননা।

অনিলবরণ

সুবিমল নন্দী লেখক হিসেবে বলিষ্ঠ। তাঁর বইও বিক্রি হয়। কিন্তু নামী পত্রিকায় তাঁর কোনও দামী সাহিত্যিক বন্ধু নেই। সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর ওঠা বসাও কম। তাঁর কাছে অনেক তরুণ লেখক আসে তাদের তিনি সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি কোনও প্রবীণ বা সমবয়সীর কাছে সাহায্য পাননা। এর কারণ তিনি কম কথা বলেন। এজন্য সবাই তাকে 'দাম্ভিক' ভাবে।

সুবিমল নন্দী

এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন পরিচয় দিলাম তার মধ্যে একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে। মানুষ চেনা মানে অন্ধের হস্তী দর্শনের মত। অন্ধরা হাতির দেহের এক বিশেষ অংশে হাত বোলায় এবং সিদ্ধান্ত নেয়। আমরাও সাধারণত লোক সম্পর্কে তার প্রথম দর্শনের ইম্প্রেসন বা আকর্ষণের দ্বারা চালিত হই এবং লোক সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তা ওই প্রথম দর্শনের ধারণা। এই ধারণা অবচেতন মনে সারাজীবন গেঁথে থাকে।

হয়তো আপনি কুন্ড স্পেশ্যালে বেড়াতে যাচ্ছেন। সারা ভারত ঘুরলেন শ খানেক লোক এর সঙ্গে আছেন, এক সঙ্গে ঘুরছেন। কিন্তু এর মধ্যে কিছু লোকের কিছু লোকের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা জমে উঠল। যাবার সময় সবাই সবাইর ঠিকানা নিল। কিন্তু একশজন যদি ঠিকানা বিনিময় করেন মাত্র ২০ জন হয়ত পরস্পরকে চিঠি লিখবেন। কিন্তু তারপর যতদিন যাবে এই কুড়িজনের মধ্যে চিঠিপত্র ক্ষীণ হয়ে আসবে। অবশেষে, জন চারেক চিঠি চালিয়ে যাবেন। এই চারজনের মধ্যে (দুজন দুজনও হতে পারে) দেখা দেবে গভীর বন্ধুত্ব। এই চারজনের বন্ধুত্বের মূল সূত্র কিন্তু ফার্স্ট ইম্প্রেসন বা প্রথম দেখা। প্রথম দেখায় যাকে যার ভাল লাগে পরবর্তী ঘটনাবলী সেই প্রথম ভাললাগাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করে দেয় মাত্র। আর এক ধরনের ইমেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নিয়ত সান্নিধ্যের দ্বারা। ধরুন প্রথম দর্শনে লোকটিকে আপনার খুব ইমপ্রেসিভ বলে মনে হলনা। কিন্তু অনেকদিন ধরে তার ব্যবহারের পর বুঝতে পারবেন লোকটি খারাপ নয়।

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই টাইপ চরিত্র। আপনি সাধারণ গুণগুলি দেখে এক একটি মানুষকে এক একটি টাইপের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। তবে এসব টাইপও মনস্তাত্বিকদের বা কবি নাট্যকার লেখক ও সিনেমাওয়ালাদের মনগড়া। তারাই কিন্তু এই টাইপ ঠিক করে দিয়েছে। একে বলে স্টিরিওটাইপ।

এই টাইপ চরিত্রগুলি সব দেশেই মোটামুটি এক। যেমন হিন্দি ছবির কল্যাণে আমরা মস্তান ও মাফিয়া বসদের টাইপ চেহারা বুঝতে পারি। নেড়ামাথা, মোটা চেহারা, চোখে কুড় দৃষ্টি, চখরা বখরা শার্ট পরা। গলার স্বর গম গম করছে। এই হলেন মাফিয়া বস। এই রকম কোনও লোককে ট্রেনে বা নির্জন পার্কে দেখলে আপনি নিশ্চয়ই ভয় পাবেন। কিন্তু বহু মাফিয়া বসদের চেহারা অতি সাধারণ সাধারণ স্কুলমাস্টারের মত। একজন বুদ্ধিজীবী মাফিয়া বসের মত চেহারা নিয়ে কী অসাধারণ প্রোগ্রাম করে যেতেন দূরদর্শনে। পি টি উষাকে একনজরে দেখলে কি ভারতের এক নং দৌড়বাজ বলে মনে হয় ? অথবা দিব্যা ভারতীকে দেখলে কী মনে হত সে কোনও দুষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িত হতে পারে কোনও দিনও ?

লন্ডনে মাদাম তুসোতে গেলে দেখবেন পৃথিবীর বহু নৃশংস খুনীকে নিরীহ কেরানীর মত দেখতে। মহাজাতি সদনে বিপ্লবীদের ছবি টাঙানো আছে। সেখানে গেলে দেখবেন আগুন খেকো বিপ্লবীদের দেখতে নিপাট সুবোধ বালকের মত।

সাহিত্যিকদের এক ধরনের স্টিরিওটাইপ চেহারা তৈরি করে দিয়েছেন সাহিত্যিকেরা নিজেরাই। পেলব চেহারা। মাথায় বড় বড় চুল। পরণে ধুতি পাঞ্জাবি। ঢুলু ঢুলু চোখ। হ্যাঁ,কাজি নজরুল এই চোহারার সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে যান, বড় বড় চুল নিয়ে শরৎচন্দ্রও মানিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথকে দেখলেই প্রথম দর্শনেই কবি বলে মনে হয়। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অথবা তারাপদ রায়ের আদৌ কবিসুলভ চেহারা নয়। একালের কবিরা বুশশার্ট প্যান্ট পরেন। আবার অনেক ব্যবসায়ীকে দেখে কবি বলে মনে হয়। অনেক অধ্যাপককে এক নজরে সিনেমার নায়ক হিসাবে মানিয়ে যায়। রোগা ন্যাংপেঙে তালপাতার সেপাইর মত কত পদস্থ পুলিশ অফিসার আর আই এ এস যে আছে ঠিক নেই। সুতরাং প্রথম নজরে যাঁরা হয়তো খুব ইমপ্রেস করেন দেখা যায় তাঁরা কর্মজীবনে অতি সাধারণ। আমি অনেক মাছিমারা কেরানী দেখেছি যাদের চেহারা বড় অফিসারদের মত। আবার অফিসারের ঘরে ঢুকে দেখেছি চেয়ারে এমন লোক বসে আছেন যে মনে হয়েছে হয়তো কোন অধঃস্তন কর্মচারী। বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব সুপুরুষ নন। ওমপুরী, অজয় দেবগণ, লতা মঙ্গেশকর, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পরলোকগতা পদমজা নাইডু। মহাত্মা গান্ধীকে কেউ নিশ্চয়ই 'সুন্দর' ও 'সুপুরুষ' বলবেন না। নেহরু ইন্দিরাগান্ধী ও রাজীবগান্ধীর চেহারার পাশে চরণ সিং, লালবাহাদুর কিংবা নরসিংহ রাওকে কী মানায় ? আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী এই প্রবাদ ঠিক হলে অসংখ্য সাধারণ দর্শন মানুষ কখনই গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি পেতেন না। আই এ এস, আই পি এসদের পার্সোনালিটি টেস্টে বহু সুন্দরী নারী পাশ করতে পারেনি কিন্তু সাধারণ দর্শনা ও আপাত দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ ব্যক্তিত্বের মেয়েরা পাশ করে যাচ্ছেন এটি কীভাবে সম্ভব হচ্ছে ?

আসলে চেহারা প্রথম দর্শনে একটা ধারণা জন্মে দেয়। রূপ সবাইকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরক্ষণেই গুণটাই বড় হয়ে ওঠে। তখন গুণ চেহারার ঘাটতিকে পুষিয়ে দেয়।

কিন্তু চেহারা থেকে প্রথম দর্শনেই কারও প্রতি অভিভূত হওয়া উচিত হবেনা। অথচ অনেক মানুষ চেহারা ভাঙিয়ে খায়। তাদের মধ্যে প্রতারকেরাও পড়ে। রূপ দেখে বিয়ে করে পরে দেখা যায় রূপবান পুরুষ আসলে একটি মনুষ্যবেশী শয়তান। আবার অনেক সময় দেখা যায় রূপবতী নারীর কোন গুণ নেই শুধু সংসার ভাঙা ছাড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে রূপের পায়ে আহুতি দেয় মানুষ। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে কিন্তু গুণে মন ভরে কী ?

॥ দুই ॥
প্রথম নজরেই ভুলবেন না।

শেক্সপিয়ারের নাটরে নায়িকারা নায়কদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়ে যেত। সম্বন্ধ করা বিয়েতে কনে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ প্রথম দৃষ্টিতেই পছন্দ বা অপছন্দ করে বসে। এই প্রথম দৃষ্টিতেই পাত্রপক্ষের চোখে পড়ার জন্য কনেরা সাজগোজ করে। গান শোনায়। সেলাই এর কাজ দেখায়। নানা বিদঘুটে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

অনেক ছেলেমেয়ে এইভাবে সম্বন্ধ করা বিয়ে করতে চায়না। কারণ এর ফলে নাকি পুরোপুরি কাউকে জানা যায়না। বিয়ের পর দেখা যায়, বিয়ের আগে প্রথম দর্শনে যাকে খুব লাজুক বলে মনে হয়েছিল, আসলে সে নির্লজ্জ বেহায়া। বিয়ের আগে প্রথম দর্শনে যাকে মনে হয়েছিল 'ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না', বিয়ের পর তাঁর চেঁচামেচিতে বাড়িতে কাকপক্ষী তিষ্ঠোতে পারে না। প্রথম নজরে দুপাঁচ মিনিট কথা বলে একটি লোকের চরিত্র কিছুতেই বোঝা যায় না। ধরুন, একজন একটু আত্মস্থ প্রকৃতির, কম কথাবার্তা বলে, গম্ভীর মুখ। প্রথম দর্শনে তাকে অহংকারি মনে হবে। কিন্তু লোকটি হয়তো সত্যিই অহংকারি নয়। খুবই বিনয়ী, ভদ্র। বহু গম্ভীর লোকও রসিক হন। রাজশেখর বসু খুব রাশভারী গম্ভীর লোক ছিলেন। কিন্তু তার রসজ্ঞান ছিলনা তা তাঁর শত্রুরাও বলবেন না।

আবার অমায়িক সদালাপী বহু লোক দেখেছি প্রথম আলাপে মনে হয়েছে দেবতা। কিন্তু মেশার পর বুঝতে পেরেছি শয়তান।

আসলে প্রথম দেখার পরই প্রতিটি লোককে আমরা একটা মনগড়া স্টিরিওটাইপ বা ছাঁচের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি। আমাদের মনে অসংখ্য স্টিরিওটাইপ গাঁথা হয়ে আছে। স্টিরিওটাইপ হল মনগড়া কতগুলি ধারণা যার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সৌম্য দর্শন ব্যক্তি যে সর্বদা পূত চরিত্রের হবেন তার কোনও মানে নেই। অনেক ভদ্রবেশী চোর বদমায়েশ ও খুনী হয়। আবার খুব খারাপ দেখতে বহু লোক মহামানব হয়। হয়েছেও। কোন কিছু প্রথম দেখার পর প্রথম যে ধারণা হয় তার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির মিল থাকে না।

যেমন কেউ যদি প্রথম আকাশে একটি প্লেন উড়তে দেখে তাহলে সে প্লেনটির প্রকৃত আকার কতখানি তা ধারণা করতে পারবেন না।

এক একটি পরিস্থিতির মধ্যে এক একজনের সঙ্গে যদি প্রথম দেখা হয় তাহলে সেই পরিস্থিতিতে বিশেষ আচরণটাই মনে গেঁথে যায়।

যে কখনও এয়ারপোর্টে প্লেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি তাকে যদি প্লেনের ছবি আঁকতে বলেন সে সব সময় পাখির মত ছোট ছোট প্লেন আঁকবে। এটি অন্ধের হস্তী দর্শনের মত। ভগবান বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় কোনও মূর্তি ছিলনা। তাঁর মহাপরিনির্বাণের বহুবছর পর বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধরা বিভিন্নভাবে বুদ্ধ মূর্তি

তৈরি করেছেন এবং মূর্তিগুলি হয়েছে তাঁরা যে যেমন বুদ্ধকে ভেবেছেন তেমনি ভাবেই।

কোনও কাজের বাড়িতে কোনও ছেলেমেয়েকে যদি প্রথম দেখেন ছুটোছুটি করছে, পরিবেশন করছে, অভ্যাগতদের তদারক করছে। তখন মনে হবে খুবই কঠোর পরিশ্রমী ও কর্মী প্রকৃতির ছেলেমেয়ে বুঝি ওরা। কিন্তু আবার এদের একজনের বাড়ি গিয়ে অভিযোগ শুনলেন, বাড়ির কুটোটি পর্যন্ত সে ভাঙেনা, কুঁড়ের হর্দ। বেলা আটট-নটা পর্যন্ত ঘুমোয়। উদ্যোগ নেই, উদ্যম নেই। অথচ ভিন্ন পরিস্থিতিতে কিছু সময়ের জন্য ছেলেটি পরিশ্রমী ও কর্মতৎপর হয়েছিল।

বহু কাপুরুষ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সমস্ত সৈন্য অসীম সাহসী একথা মনে করার কোনও কারণ নেই। বহু সাহসী ছেলে সেনা বিভাগে যোগ দিয়ে ট্রেনিং এর সময় প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এসেছে। আমি এইরকম পালিয়ে আসা একজন জওয়ানকে জানতাম। ছেলেটি পরে পুলিশে চাকরি নেয়। তার স্বাস্থ্য খুবই ভাল। খুব চটপটে ছেলে। পাড়ায় যে কোনও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু সেনাবিভাগ থেকে যখন পালিয়ে যাচ্ছে, তখন কেউ যদি তাকে দেখত তাহলে বলত অপদার্থ, ভীরু, কাপুরুষ। অনেক সময় অনেকে সাময়িক শক কাটিয়ে উঠতে পারেনা। যখন ট্রেনিং হচ্ছিল তখন যদি ছেলেটিকে একটু মোটিভেট করা যেত, যদি তারমনকে একটু চাঙ্গা করে দেওয়া যেত তাহলে সে পালিয়ে আসত না।

কলকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে আজকাল শহিদ বেদী দেখতে পান। মফঃস্বল শহরেও এই ধরনের বেদী হয়েছে, হচ্ছে। এখুনি পাড়ার কোন এক অখ্যাত শহিদের স্মরণে, যে হয়তো পুলিশের গুলিতে মারা যায় অথবা রাজনীতি করতে গিয়ে বিপক্ষ দলের ছোরা বা বোমের আঘাতে প্রাণ দেয়—তার বন্ধুবান্ধব বা দলের লোকেরা তাকে এখন শহিদ বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু উন্মাদনার বশে জীবন দেওয়ার মধ্যে কৃতিত্ব কিছু নেই। যখন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল জনতা বা একটি গ্রুপ ক্ষেপে যায় তখন তারা সাময়িকভাবে পাগল হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে একজন যা কখনই করতনা, দলে পড়ে সে তখন তাই-ই করে। একে বলে 'গণমৃগীরোগ'—'মাস হিস্টিরিয়া'। এই রোগে আক্রান্ত হলে একজন সাময়িকভাবে খুব বলশালী ও সাহসী হয়ে ওঠে। সে তখন সামনে যা পায় চুরমার করে। প্রতিপক্ষকে খুন করতে এগিয়ে যায়। পুলিশকে ভয় পায়না। ইতিহাসে যাকে গণ অভ্যুত্থান বলা হয় তা এক প্রলম্বিত মাস হিস্টিরিয়া। এর ফলে গৃহযুদ্ধ হয়। ভাই ভাইকে খুন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে, হঠাৎ মাস হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুদল দুদলকে আক্রমণ করল।

যারা সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চায় সেই সব ব্যক্তি সুকৌশলে জনতার মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়। তারপর জনগণ যা করার তা করে। কাজ হাসিল হয়ে

গেলে পিছনের এই নায়করা এই পরিবর্তনের ফলভোগ করে।

দাঙ্গা, গৃহযুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থান, নৃশংস সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের মধ্যে যারা লিপ্ত থাকে বা লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের দেখে মনে হতে পারে এরা অসীম সাহসী। জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য করেছে এরা। এরা যদি জয়ী হয় তাহলে এদের হিরো করে কত বই লেখা হয়, কত সিনেমা হয়। কিন্তু এই সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ সকলের কাছে দীর্ঘস্থায়ী কোনও গুণ নয়।

আপনি দেখবেন, বহু সন্ত্রাসবাদী সাহসী নেতা পরবর্তীকালে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁরা মুচলেকা দিয়েছেন, আর এমন কাজ করবেন না। তাঁরা এখন ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। ভোটের রাজনীতি করছেন।

আদর্শবাদী সর্বত্যাগী নেতা পরবর্তীকালে দুর্নীতির পাঁকে ডুবে গেছেন। নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য অগাধ সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন। কোটিকোটি টাকার ঘুষ খেয়েছেন।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ৭০ এর দশকে যে সব বিপ্লবী মুক্তি আনতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন ধনতন্ত্রের পদলেহী চাটুকার। তাঁরা বড় বড় শিল্পপতি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে চাকরি করে তাঁদের কায়েমী স্বার্থের বাহক হয়েছেন।

এক সময় যিনি মানুষ খুন করেছেন মশা মাছি মারার মত, পরবর্তীকালে তিনি একটি পিঁপড়ের গায়েও হাত তুলতে রাজি নন। চরম সহিংসবাদী থেকে চরম অহিংসবাদীতে উত্তরণের অজস্র ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ। স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর ডাকে বহু সহিংস বিপ্লবী অহিংস হয়ে গেছেন। চরম সহিংস বিপ্লবী অরবিন্দ—যাঁর ছেলেবেলার পরিবেশের মধ্যে আধ্যাত্মভাবনার কোনও অবকাশ ছিলনা, থাকলেও তাঁর খ্রীষ্টান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বেদ ও গীতা প্রভাবিত আধ্যাত্মিক ভাবনায় লীন হয়ে গেলেন। তাহলে এক নজরে কাউকে দেখে বা তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে তার সম্পর্কে কোনও দীর্ঘস্থায়ী সঠিক ধারণায় আসা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের মন সতত পরিবর্তনশীল। এজন্যই বিয়ে ভেঙে যায়। অথচ বিয়ে ভালবেসেই হোক বা সম্বন্ধ করেই হোক, কেউ না কেউ পাত্রপাত্রী পছন্দ করেছিল এবং তাদের মনে হয়েছিল এই বিয়ে হবে রাজযোটক। সম্বন্ধ করা বিয়েতে শ্বশুর শাশুড়ি বউ পছন্দ করে নিয়ে আসে। এক পলকে দেখে বা একটু কথা বলে মোহিত হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পর সেই বউ আগে শ্বশুর শাশুড়ির 'খপ্পর' থেকে বেরিয়ে আসে। আলাদা বাসা করে। বাসা না করলেও এক ছাদের তলায় থেকে নিত্য অশান্তি বাঁধায়।

আর ছেলেমেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করল, পরে সে বিয়েও ভেঙে গেল। এ তো আকছার হচ্ছে।

কত গভীর ভালবাসা দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণায় পরিণত হয়। কিন্তু কেউতো পরিণতি কি হবে বুঝতে পারেনা। যাকে উদার বলে ভেবেছিলাম সে যদি সংকীর্ণ বলে

পরবর্তীকালে ধরা পড়ে যায় তখন ভাবতেই হবে মানুষ চেনা সহজ নয়। প্রথম দৃষ্টি বা প্রথম আলাপের পর একটি মানুষ সম্পর্কে যে ধারণা সেটি 'প্রথম ধারণা' বা ফার্স্ট ইম্প্রেসন মাত্র।

আমাদের অবচেতন মনে এই 'ফার্স্ট ইম্প্রেসন' দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করে। পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে ট্রেনে, পার্টিতে, পিকনিকে প্রতিদিন কতলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। কখনও আলাপ হয় নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

যেমন আপনি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। রাত হয়ে গেছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আপনি দেখলেন রাস্তায় একটি মহিলাকে টিজ করছে কতগুলি ছেলে ; আপনি রুখে দাঁড়ালেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি কোথায় ? তারপর একটি ট্যাক্সি ডেকে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। এখন আপনার সম্পর্কে ওই মহিলার ও ওই মহিলার সঙ্গে আপনার একটি প্রথম ধারণা তৈরি হয়ে গেল যার প্রভাব সারাজীবন দুজনের উপর থাকবে।

আবার কর্মসূত্রে প্রতিদিন আমাদের জীবনে 'প্রথম ধারণার' ঘটনা ঘটে। আপনাদের অফিস সাবান বেচার সূত্রে দেখা করার জন্য আপনাকে পাঠাল মিঃ কুলকার্নির কাছে। আপনি মিঃ কুলকার্নিকে আগে কখনো দেখেননি বা তাঁর সম্পর্কে কিছু শোনেননি। মিঃ কুলকার্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তার সম্পর্কে আপনার একটি প্রথম ধারণা হবে। আপনি ফিরে এসে বসকে রিপোর্ট করবেন কুলকার্নি কিরকম ব্যক্তিত্ব।

অধিকাংশ চাকরি দেওয়া হয় ইন্টারভিউ করে। এই ইন্টারভিউ কিন্তু সম্পূর্ণ 'প্রথম ধারণা' ভিত্তিক। কারণ ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা প্রার্থীকে আগে কখনও দেখেননি। তারা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনের ভেতর প্রার্থী সম্পর্কে কতগুলি প্রক্রিয়া কাজ করতে থাকে। পাঁচমিনিটের মধ্যে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যদি দেখেন ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য কোনও প্রার্থীকে এক নজরে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন ; তিনি মনে মনে চাইছেন প্রার্থী পাশ করুক তখন তিনি কোনও শক্ত প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করেন না। আর যে সদস্যের মনে হবে এই প্রার্থীকে দিয়ে চলবে না, তিনি তাকে কড়া কড়া প্রশ্ন করবেন।

প্রথম 'ইম্প্রেসন' গড়ে ওঠে চেহারা, পোশাক ভঙ্গ পরিচ্ছদ, অঙ্গ, পোশাক প্রসাধন, নাম, জাতীয়তা, জাত-পাত ও কথা বলার ভংগি এবং সেই সঙ্গে যিনি বিচার করছেন তাঁর মানসিক গঠনের ওপর। মানুষ চেনা যেমন কঠিন, মানুষকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করাও তেমন কঠিন। কারণ আমরা কাউকে সত্যিকারের বিচার করিনা, আমরা আমাদের কতগুলি বদ্ধমূল ধ্যান ধারণার আয়নায় অন্যের প্রতিচ্ছবি দেখতে চাই। আমি ভাবি আমিই বিশ্বের একমাত্র নিখুঁত লোক। সুতরাং বাকিরা সবাই আমার মত হবে। যে হবে না তাকে নানা ছুতোয় নাতায় ফেল করিয়ে দেই। স্কুল কলেজের পরীক্ষায় পরীক্ষক অনেক সময় গ্রেস দিয়ে পাশ

করান। আমরা আমাদের মতাবলম্বীদের গ্রেস দেওয়া দূরে থাকুক তাদের খাতাটাই লিখে দেই। আর যাদের দেখতে নারি তাদের চলন বাঁকা।

অফিস প্রেম

॥ তিন ॥
বংশলতিকা ফেলনা নয়

মানুষ চেনার একটা উপায় হচ্ছে তার বাবা মাকে চেনা। কারণ এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ছেলেমেয়েরা বাবা মায়ের ভাল গুণ কিংবা বদগুণের অনেকটাই পায়। কিন্তু একথা বললে আবার অনেক প্রগতিশীল রাগ করবেন। বলবেন, মশাই আপনি অভিজাততন্ত্র প্রচার করছেন। কিন্তু আমি মনোবিজ্ঞানীদের কথা বলছি।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে বুদ্ধি কারও কম বেশি থাকতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ মানেই ভাল মানুষ নয়। যাদের বুদ্ধি বেশী, তারা বুদ্ধি ভাঙিয়ে জীবিকা অর্জন করেন। তাঁদের বলা হয় বুদ্ধিজীবী। এঁদের সংখ্যা সব সমাজেই কম। শ্রমজীবীদের সংখ্যাই বেশি। তাঁরা গতর খাটিয়ে উপার্জন করেন। পরিশ্রম করতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না। তাছাড়া তাদের যেমন যেমন কাজ করতে শেখানো হয় তাঁরা ঝটপট শিখে নিয়ে সেটি নিজে হাতে কলমে করেন অথবা তিনি তদারক করেন, অন্যেরা করে। যেমন ধরুন প্রযুক্তিবিদদের কাজ। অথবা মেকানিকদের কাজ। এঁরা নৈপুণ্য শেখেন। এই নৈপুণ্য শিক্ষার ব্যাপারটা বংশানুক্রমিক কোনগুণ নয়। বাবা ভাল ইঞ্জিনিয়ার বা মোটর মেকানিক হলে ছেলে ভাল ইঞ্জিনিয়ার বা মোটর মেকানিক হবে

তার কোনও মানে নেই। তবে বাবা মা যদি খুব বুদ্ধিমান হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরাও বুদ্ধিমান হয়।

কিন্তু বাবা মা যদি দুজনেই অল্পবুদ্ধি বা স্বল্প মেধার লোক হয় তাহলে ছেলেমেয়েদের খুব বেশি চালাক চতুর না হবারই প্রবণতা থাকে। বাবা মায়েব মেজাজও উত্তরাধিকার সূত্রে ছেলেমেয়েরা পায়। বাবা মা দুজনেই উগ্রমেজাজী ছেলে শান্তশিষ্ট কম দেখা যায়। উলটোটাও সত্য। চেহারা, গায়ের রঙ, মুখের আদল, লম্বা রোগা, বেঁটে এসবই উত্তরাধিকার সূত্রে আসে। বাবা মায়ের পূর্বপুরুষের গায়ের রঙ কেমন ছিল তা জানতে পারলে অঙ্ক কষে বলে দেওয়া যায় কোন ছেলেমেয়ের গায়ের রঙ কেমন হবে। অনেক সময় দেখা যায় বাবা মা দুজনেই ফর্সা, সব ভাই ফর্সা, কিন্তু একটি মাত্র বোনের রঙ কালো। আবার বাবা মা শ্যামবর্ণ। কিন্তু খুব ফর্সা বাচ্চা হয়েছে।

সুতরাং 'হেরিডিটি' বা বংশ হিন্দিতে যাকে খানদান বলা হয়, তা নিয়ে যতই হাসাহাসি করুন না তার একটা বিরাট প্রভাব আছেই। এই বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অভিজাতরা বিয়ে থার ব্যাপারে অনুরূপ বংশ খোঁজেন। আগে রাজারা রাজপরিবারেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতেন। এখনও তাই হয়। তবে আধুনিক যুগে ছেলেমেয়ে নিজেরাই বিয়ে করছে। এতে করে তথাকথিত খানদান বজায় থাকেনা।

ইংলন্ডের রাজপরিবারেই তো সাধারণদের সঙ্গে বিয়ে হওয়া শুরু হয়েছে।

ভারতবর্ষে জাতিভেদ এত কড়া ছিল যে বেজাতে বিয়ে হতনা। মহাভারতের যুগে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। বল্লাল সেনের সময় কৌলিন্য প্রথা এল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যেও আবার আর একটা প্রাচীর উঠল যারা কুলীন। কুলীনদের মুষ্টি-ময় কুলীনদেরই 'অভিজাত' বলে ধরা হত।

সব জিনিষের ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। 'ভারতবর্ষে' এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিয়ে শাদি জাত পাতের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুধু কায়স্থদের, নমঃশূদ্ররা শুধু নমঃশূদ্রদের এর ফলে এক বর্ণের ভাল জিনিষটা অন্য বর্ণের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারেনি। তাহলে ভারত মিশ্র জাতি হল কীভাবে ? শক হূন দল এক দেহে লীনই বা হল কীভাবে ? সেটি হয়েছে চোরাগোপ্তা ভাবে। অথবা ব্যাপক নারী হরণ করে। বিজয়ীরা এদেশে এসে বসে গেছে। ভারতীয় নারী জোর করে বিয়ে করেছে। বহু হিন্দু মুসলমান হয়েছে, মুসলমানরা আবার বহু উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে। নিশ্চয়ই এইসব বিয়ে হয়েছে সমাজের অনুমতি ছাড়াই। ভারতে ফিরিঙ্গি বণিকরা ব্যবসা করতে এসে বহু রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে ঢুকে পড়েছে। অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে, আবার উচ্চবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু খ্রীষ্টান হয়ে আর একজন নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানকে বিবাহ

করেছে। এই ভাবে কিছুটা মিলন হয়েছে। বিশেষ করে আর্য ও অনার্যদের রক্তের মিশ্রণ উত্তর ভারতে ও পূর্বভারতে খুব বেশি করে হয়। পশ্চিমভারতে ততটা হয়নি। পাঞ্জাবি হিন্দু মুসলমান বা পাঠানদের মধ্যে রক্তের তথাকথিত পবিত্রতা বজায় আছে। এটি তাদের চেহারা ও আচার আচরণে স্পষ্ট।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে অবলম্বন করে এক একটি জাতি ছিল। সব জাতির মধ্যে সমান মিশ্রণ ঘটেনি। তাছাড়া মিশ্রণের প্রক্রিয়াও খুব মন্থর। সব জাতির উচ্চবর্ণের মধ্যে বিয়ে থার ব্যাপারে বর্ণাশ্রম খুব কঠোর ভাবে মেনে চলা হত। এর ফলে দীর্ঘকাল সমাজের ওপরের তলায় কোনও মিশ্রণ হয়নি। উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিয়ে হয়নি। এক ভাষাভাষীর উচ্চবর্ণের সঙ্গে অন্য ভাষাভাষীর উচ্চবর্ণের বিয়ে থার প্রচলনও ছিলনা। একজন মারাঠি ব্রাহ্মণ এখনও তাঁর মেয়ের সঙ্গে বাঙালি ব্রাহ্মণের বিয়ে দেবেন না। অথবা গুজরাতি কায়স্থ দক্ষিণী বৈশ্যের সঙ্গে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবেন না। ভারতবর্ষ যেন একটা ট্রেন। ট্রেনটি চলেছে একই গন্তব্যস্থলে। প্রত্যেকটি বগিতে আলাদা আলাদা যাত্রীরা আছেন। কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই।

একে বলে ফেডারেশন। রাশিয়া এমন ফেডারেশন কিন্তু মিলে মিশে একটা জাতি তৈরি করতে পারেনি। কারণ রাশিয়াতে এথনিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমেরিকায় এথনিক স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই। অস্ট্রেলিয়ায় নেই। ও দেশে জাতপাত নেই। আলাদা করে হোম স্টেট নিয়ে আঞ্চলিকতাবোধ নেই। সকলের সঙ্গে সকলের বিয়ে হচ্ছে। যার যাকে ভাল লাগছে বিয়ে করছে। এর ফলে সত্যিকারের মিশ্র রক্তের উদ্ভব হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে। কিন্তু উত্তরাধিকার তত্ত্ব যদি মানি তাহলে দেখব আমেরিকানদের মধ্যে জাতিগতভাবে কোনও বিশেষ ভাল গুণ বা খারাপগুণ নেই। যেমন জর্মানদের মধ্যে আছে, ইংরেজদের মধ্যে আছে, ফরাসিদের মধ্যে আছে। আমেরিকা অতবড় ধনী দেশ এত টাকা খরচ করে শিক্ষা খাতে। কিন্তু গড় আমেরিকান ছেলে মেয়েরা যে সবাই প্রচণ্ড বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী তা নয়। এখনও বড় বড় বিজ্ঞানী, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী বলতে যা বোঝায় তারা বাইরে থেকে এসেছে। অর্থাৎ মোহনবাগানের হয়ে খেলছে ভাড়া করা খেলোয়াড়রা। সারা পৃথিবী থেকে ছেঁকে ছেঁকে ভাল ভাল মাথা আমেরিকা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। তাদেরই আমেরিকান বলে চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল অধ্যাপক হয় চিনা, না হয় জাপানি, কোরিয়ান কিংবা ভারতীয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই। ব্যবসাবাণিজ্যও ইহুদিরা অথবা জাপানিরা চালাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক ছাত্রই বিদেশী। যদি আমেরিকা আজ বলে আমরা বিদেশী ছাত্র নেবনা, তাহলে উচ্চশিক্ষা নেবার মত যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট আমেরিকান ছেলেমেয়েই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু অন্যদিকে একটা সুবিধেতো আছেই, জাতপাতহীন বিবাহের ফলে

প্রতিভা একটি বিশেষ ছেলেমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না। একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী গিয়ে একজন অজ্ঞাতকুলশীল আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করলেন। তাঁদের ছেলে মেয়েরা বাবারা কিছুটা বুদ্ধি অন্তত পাবে বলে আশা করা যায়। আবার উলটোটাও হতে পারে মেয়ের দিকের বা ছেলের দিকের বংশগত রোগ থাকলে তা পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রামিত হয়। এছাড়া বংশের কিছু কিছু নেতিবাচক গুণও তাদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক এথনিক জাতির একটা নিজস্ব মূল্যাবোধ, সংস্কৃতি বিশ্বাস থাকে। এগুলি বিরোধী মূল্যাবোধের সংস্পর্শে এলে নানা সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে ঠিকুজি কুষ্ঠী কিংবা পনের কথা না ভেবে এটা ভাবা উচিত পাত্রপাত্রী নির্বাচনের সময় পাত্রপাত্রীর সুস্বাস্থ্য বিদ্যা-বুদ্ধি ও গুণই আসল। আবার পাত্রপাত্রীর নিজের গুণাবলী থাকলেই হলনা, তার পারিবারিক পরিবেশ কি রকম, মাতৃকুল কি রকম এসব পরিচয়ও নেওয়া দরকার। চিনে বিয়েব আগে ছেলেমেয়ের রক্তপরীক্ষা আবশ্যিক। মনু বলেছেন, নারীরত্ন দুষ্কুলাদপি। অর্থাৎ নরীরত্ন আহরণ করতে হলে কুলশীল দেখার দরকার নেই। মনু অবশ্য রূপবতী নারীকেই রত্ন বলে অভিহিত করেছেন। সে সময় বহু বিবাহ ছিল। সব স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করার দরকার হতনা। পরে পছন্দ না হলে স্ত্রীকে পুরুষ সহজেই ত্যাগ করত। এখন এই যে আবার ডিভোর্স বেড়েছে তার পিছনে কারণ বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বংশকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রেমজ বিয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন পরিবার, তাব পটভূমি দেখার প্রশ্নই উঠছেনা।

আবার সম্বন্ধ করা বিয়ের ক্ষেত্রেও পাত্রের মোটা আয় ও পাত্রীর রূপ ও পণ দেবার ক্ষমতার ওপরেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়। ভদ্র-সদ্বংশ জাত গরিবের সাধারণ মেয়ে, পড়াশোনায় খুব ভাল, শিক্ষিত পরিবারের বহু মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা, তার কারণ মানুষ চেনার মাপকাঠি এখন টাকা। টাকা থাকলেই এখন আমরা তাকে বিরাট কিছু ভাবছি। বাড়ি গাড়ি থাকলেই কালচার হয়না। আবার কালচার পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা উচ্চবর্ণের মধ্যেই আছে আমি তা মানতে রাজি নই। আমি তফশিলি অনেকের মধ্যে অসাধারণ কালচার দেখেছি। তারা ছেলেমেয়েদের সেভাবে মানুষ করেছেন। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে অমানুষ বাউন্ডুলে মদ্যপ চরিত্রহীন দেখেছি। বাবা মা নীচ সংকীর্ণচেতা, সাম্প্রদায়িক হলে ছেলেমেয়েরাও বহুলাংশে সংকীর্ণমনা হবে। এমনকি মামার বাড়ির বদগুণও ছেলেমেয়েরা জিনের ভেতর দিয়ে পায়। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মকে যদি উন্নততর করতে হয় তাহলে বিয়ে থার ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্বজাতি বা বিজাতির মধ্যেই যে বিয়ে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। দিলেও কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু দেখতে হবে—

১. পাত্র বা পাত্রীর পরিবারে পুরুষানুক্রমে লেখাপড়া শেখার চল আছে কিনা।

২. তাদের সামাজিক পরিচিতি কীরকম। সম্মানজনক না অসম্মানজক ?

৩. কয়েকটি ছোটখাটো পরীক্ষা নিয়ে, দেখা যে তারা মানুষ হিসাবে মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় পাশ করলেন না ফেল করলেন—
৪. দেখতে হবে পাত্র ও পাত্রীপক্ষের ট্র্যাডিশনটি কীরকম। কৃপণ, অনুদার, অসংস্কৃত ও অহংকারি পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে যারা মানুষ হয়েছে, তারা স্বতন্ত্রভাবে ভাল হলেও তাদের মধ্যে পারিবারিক মালিন্যের কিছু না কিছু ছোপ থেকে যায়ই।

॥ চার ॥
জাত-পাত দিয়ে মানুষ বিচার করবেন না

অনেক কাল আগে আমার বোনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলাম এক জায়গায়। আমার বোনকে দেখতে সুশ্রীই ছিল। পাত্রও এমন কিছু আহামরি নয়, খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। তবে ব্যাঙ্কে কেরানীর চাকরি করত। পাত্রী পছন্দ হল। কিন্তু বিয়েটা ভেঙে গেল এই কারণে যে আমার বোনের দাঁতের পাটিতে সামান্য ফাঁক ছিল। (পরবর্তীকালে সেটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল)। সেটাই নাকি চেহারার মস্ত খুঁত। পাত্রের বাবা এসে বললেন, আপনাদের মেয়েতো পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু ওই দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকায় আমার স্ত্রীর আপত্তি।

অর্থাৎ দুই দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকলে মেয়ে অলক্ষুণে হয়।

চেহারা নিয়ে নানা কুসংস্কার মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে। যেমন ছেলেবেলায় শুনতাম, কটা শূদ্র বেঁটে মুসলমান ও কালো বামুনদের থেকে দূরে থাকা উচিত। এরা নাকি সচরাচর ভাল লোক হয়না।

এখন প্রথম দৃষ্টিতেই একজন গৌরবর্ণ শূদ্র, বেঁটে মুসলমান ও কালো ব্রাহ্মণদের দেখলেই অবচেতন মন থেকেই একটি বীতরাগ এসে উপস্থিত হবে। অথচ একজন মানুষ লম্বা বা বেঁটে হওয়ার জন্য কিছুতেই তাঁর জীবনে বুদ্ধি সততা বা নীতিবোধের তারতম্য ঘটতে পারে না। একজন ফর্সা বা কালো হওয়ার জন্য তার মধ্যেও গুণের কোনও ইতর বিশেষ ঘটেনা।

আমেরিকায় নিগ্রোদের ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের নিগ্রোরা মনে করেন এরা সমস্ত দিকেই শাদা মানুষের যোগ্য নন। কিন্তু যখনই সুযোগ দেওয়া হয়েছে তখনই কৃষ্ণাঙ্গরা প্রমাণ করেছেন শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁরা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে মোটেই কম নন।

ভারতবর্ষে তফশিলিদের পরিচয় জানতে পারলেই বহু বর্ণ হিন্দুকে তাচ্ছিল্যের সুরে নানা মন্তব্য করতে শোনা যায়। তফশিলি কোটায় যাঁরা চাকরিতে ঢোকেন, তাঁরা কাজকর্ম কিছুই জানেন না, এমন একটা ইম্প্রেসন দেওয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও

হৃদয়বৃত্তির বিকাশ জাতপাতের ওপর নির্ভরশীল নয়। মনে রাখতে হবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তফশিলি সমাজের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। বাবা-মা যদি নিরক্ষর হয় এবং এমন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে যাতে বিদ্যাবুদ্ধি চর্চার প্রয়োজন হয় না, তাহলে তাদের সন্তানরাও সেই পরিবেশে মানুষ হয়। তারফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা প্রতিযোগিতার উপযোগী হয়ে ওঠে না। আপনি যদি মস্তিষ্ককে বেশি ব্যবহার না করেন তাহলে মস্তিষ্কেরও উন্নতি হবেনা। বাবা ম্যাট্রিকুলেট হলে ছেলে গ্র্যাজুয়েট, ছেলে গ্র্যাজুয়েট হলে নাতি এম এ—এইভাবে শিক্ষার প্রগতি হয়। কিন্তু বাবা মা নিরক্ষর থাকলে এবং সমাজ নিরক্ষরদের সাক্ষর করার প্রয়োজন অনুভব না করলে নিরক্ষরের ছেলেমেয়ে নিরক্ষরই থেকে যায়। কিন্তু যখনই তার একবার পরিবর্তন হতে শুরু করে তখনই সে পরিবর্তন ঊর্দ্ধমুখী হতে বাধ্য। আজ যে তফশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার জাগরণ দেখা দিয়েছে, তিনচারটি প্রজন্ম যেতে দিতে দিন তাদের মধ্যে ক্রমশ উন্নততর সন্তান জন্ম নিতে শুরু করবে। উন্নত বলতে আমি মেধার দিকটাই শুধু বলছি। মানবিক দিকের কথা বলছিনা। **কারণ এটি বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য যে একজন মানুষের খাঁটি মানুষ হওয়া না হওয়া তার জাতি বর্ণ বা ভাষার উপর নির্ভর করেনা। নির্ভর করে কিছুটা তার উত্তরাধিকার, কিছুটা পারিবারিক পরিবেশ ও বেশিরভাগটাই তার ব্যক্তিসত্তার উপর। যাকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন, Individuality।**

অ্যালপোর্ট প্রমুখ বৈজ্ঞানিক যারা জিন নিয়ে অনেক কাজ করেছেন, তাঁরা বলেন, ৪৬টি ক্রমোসোম থেকে নবজাত শিশুর দেহে ৩০ হাজার জিনের উৎপত্তি হয়। এই প্রতিটি জিনই এক একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সূচক। কিন্তু বংশধারা অনুসারে একই গুণ বা trait এর দ্বিত্ব হওয়ার সম্ভাবনা এতই কম যে প্রত্যেকটি লোকের চরিত্রই আলাদা আলাদা হয়। একমাত্র শ্যামদেশীয় যমজ ছাড়া দুই ভাইয়ের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রের মিল থাকেনা। মিলের সম্ভাবনা ৩০ লক্ষ কোটিতে একটি। অর্থাৎ চোখে পড়ার মত নয়।

অবশ্য অ্যালপোর্টের এই তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে। দুই ভাইয়ের চরিত্র ও মানসিকতার মধ্যে মিল থাকে এও দেখা গেছে। কিন্তু আগেই বলেই বলেছি পূর্বপুরুষের অনেক চরিত্র লক্ষণ ৯trait) পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দেখা দেয়। তবে সেই সঙ্গে একথাও সত্যি, শিক্ষিত বুদ্ধিমান সংস্কৃতিমনস্ক ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম একদিনে সৃষ্টি করা যায়না। এরজন্য কয়েকটি প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হয়। আজ ভারতবর্ষে যে সব জায়গায় জাতপাতের বেড়া ভেঙে যাচ্ছে এবং অশিক্ষার অন্ধকার যেখানে যেখানে দূর হচ্ছে সেসব জায়গায় আর দুএকটি প্রজন্ম অপেক্ষা করলেই আর পশ্চাদমুখীনতা একেবারেই থাকবে না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমার সঙ্গে যে সব তফশিলি ছেলেমেয়েরা পড়ত তারা তখন সবে গ্রাম থেকে এসেছে। অধিকাংশের বাবা মা হয় নিরক্ষর না হয় তাঁদের লেখা পড়া সামান্য। তাঁদের

ছেলেমেয়েদের চালচলনে আড়ষ্টতা ছিল। উচ্চারণে জড়তা ছিল। তারা সরকারি বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষা নিল। সংরক্ষিত কোটায় উচ্চপদের সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়ল। তারা অনেকে কেউ আই এ এস, কেই আই এফ এস, কেউ আই পি এস হল। কিন্তু অনেকের মধ্যেই দেখেছি সারাজীবন ধরে একধরণের জড়তা থেকে গেছে। হরিজন পরিবাবে জন্মগ্রহণের হীনমন্যতা তারা কেউ কেউ দূর করতে পারেনি। তাঁরা অনেকেই উচ্চবর্ণের ঈর্ষা ও বিদ্রুপের পাত্র হয়েছেন। এক নজরে, পদবি দেখে যারা মানুষকে বিচার করে তাদের সামনেতো সেই মান্ধাতা আমলের স্টিরিওটাইপ থাকে। সেই স্টিরিও টাইপ হল যত বুদ্ধি সব উচ্চবর্ণের লোকদের। নিম্নবর্ণের লোকদের দিয়ে প্রশাসন চলেনা। কারণ তারা এ ব্যাপারে অদক্ষ। কিন্তু আমি এক এক করে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেব তফশিলি অফিসারদের মধ্যে বহু অফিসারের দক্ষতা যে কোনও গড় উচ্চবর্ণের অফিসারের থেকে বেশি। তদুপরি, তাঁদের বিনয়, নম্রতা এবং মানুষ হিসাবে সততা আমাকে বহুবার মুগ্ধ করেছে।

এইবার আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত তফশিলি সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মের কথা বলি। তারা বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়ে। এরা কিন্তু নিজেদের যোগ্যতায় সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় নিজেদের স্থান অধিকার করে নিচ্ছে। এদের উচ্চারণের মধ্যে চেহারার মধ্যে, আদব কায়দার মধ্যে কোনও হীনামন্যতা নেই।

আপনি ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি সম্প্রদায় ও ভাষাভাষীর ছেলেমেয়েদের একটি হস্টেলে রেখে পড়ান। পড়াশোনা শেষ হলে তাদের প্রত্যেককে ভাল চাকরি বাকরি দিন। এবার তারা বিয়ে থা করে সংসার ধর্ম করুক। প্রত্যেকেই বিয়ে করুক অনুরূপ শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের শিক্ষিত মেয়েদের। এইবার তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমীক্ষা চালান। তবে দেখবেন প্রত্যেকের ছেলেমেয়েরাই যেন ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়।

এইবার একটি শিবিরে এই দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ডেকে একে একে ইন্টারভিউ নিন।

দেখবেন জাতপাত সম্পর্কে আপনার সমস্ত স্টিরিওটাইপ ভেঙেচুরে খানখান হয়ে গেছে। দেখবেন, তীব্র প্রতিযোগিতায় হয়ত তফশিলির ছেলে প্রথম হয়েছে। উচ্চবর্ণের ছেলেরা পিছিয়ে গেছে। সবচেয়ে স্মার্ট ও সপ্রতিভ চেহারার মেয়েটি হয়ত (হরিজনের) মেয়ে।

স্টিরিওটাইপ আমাদের মানুষ চিনতে ভীষণ ভাবে বিভ্রান্ত করে। আর স্টিরিওটাইপ গড়ে ওঠে মহাকাব্য, লোকগাথা, উপকথা, লোককাব্য, সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্র থেকে। এমনকি মুখেমুখে চলিত বিশ্বাস থেকেও। আমাদের মহাকাব্যগুলিতে আর্যবিজেতাদের জয় ও অনার্যদের পরাজয়ের কথা আছে। রামায়ণের কিছু কিছু মানবিক কথা বাদ দিলে রামায়ণ একটি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল মহাকাব্য। এই মহাকাব্যে বহু অর্থনৈতিক কাজকে নৈতিক ও

দেশাচার বলে চালানো হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে রাক্ষসদের কথা আছে। রাবণ নিজেই রাক্ষসদের রাজা ছিলেন। এই রাক্ষস কারা ? না অনার্যরা। তারা সভ্য হলেও অনার্য, তাদের গায়ের রঙ কালো। চেহারা খুব শক্ত সমর্থ। এখন অনার্য তথা কালো ব্যক্তি মাত্রই 'রাক্ষস' এই স্টিরিওটাইপ মনে জেগে ওঠে। অতএব কালো লোকের বিরুদ্ধে ফর্সা লোকদের একটা ঘৃণা শিশুকাল থেকে তৈরি হয়। আবার যারা কালো তাদের মধ্যেও হীনাস্মন্যতা থাকে।

অনেককাল আগে একবার তামিলনাড়ু বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার মেয়ের তখন দেড়বছর বয়স। আমার মেয়ে ছেলেবেলায় বেশ ফর্সা ছিল। পুতুলের মত দেখতে ছিল। মাদুরাইতে মীনাক্ষী মন্দিরের চত্বরে বিশ্রাম নিচ্ছি। একদল কলেজের মেয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন আমার মেয়েকে দেখে আদর করে কোলে নিতে এল, মেয়ে কিছুতেই গেলনা।

তখন কলেজের মেয়েটি বলছে, 'জানি, আমার কাছে কেন এলেনা, কারণ আমরা কালো।'

কালো বামুনরা যদি খারাপ লোকের স্টিরিওটাইপ হবে তাহলে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই কালো, তাঁরা তাহলে সবাই খারাপ লোক। আর মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ভর্তি বেঁটে মুসলমান। তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ কেন, মহাদেশ উজাড় হয়ে যায়।

গল্প উপকথার মাধ্যমে স্টিরিওটাইপ

১. 'নাপিতরা ভীষণ ধূর্ত।'

২. পূজারী ব্রাহ্মণরা লোভী

৩. জাঠ ও রাজপুতরা ভীষণ সাহসী।

লোকমুখে প্রচারিত নানা অপবাদের মধ্যে এই অপবাদ গুলি এখন বেশ চালু—

১. বাঙালি ভীষণ কর্ম বিমুখ।

২. বদ্যি ও বারেন্দ্ররা দল পাকাতে ওস্তাদ।

৩. গোয়ালারা বোকা। ৮০ বছরে তারা সাবালক হয়।

এই ধরনের অসংখ্য স্টিরিওটাইপে বিশ্বাস করতে করতে মনের প্রসারতা ও নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়, ছোটবেলা থেকে এসব শুনতে শুনতে কতগুলি বিশেষ জাত পাত সম্পর্কে মানুষের মনে নানা প্রতিরোধ জাগে। ধরুন, একজন নাপিতকে দেখা মাত্র আপনি ধারণা করে নিলেন সে বড় ধূর্ত। একজন জাঠকে দেখা মাত্র ধারণা করলেন, সে ভীষণ সাহসী। কিন্তু সাহস ও ধূর্তামি জাতপাতের উপর নির্ভর করেনা। এগুলি সবই ব্যক্তিগত দোষ ও গুণ।

বাঙালি কর্ম বিমুখ এই স্টিরিওটাইপটিও তীব্র বাঙালি বিদ্বেষ থেকে এসেছে। বাংলার বাইরে বাঙালি কঠোর পরিশ্রম করে। এখনও সারা পৃথিবীতে বাঙালিরা অনেক বড় বড় পদে রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এটা সম্ভব হত না।

মহারাষ্ট্রে মারাঠি গুজরাতে গুজরাতিদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ শুনবেন তারা কাজ করেনা। তবে শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। বাংলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নয়। অধিকাংশ বাঙালির স্বাস্থ্য খারাপ। এসব কারণে বাঙালি বেশি পরিশ্রম করলে হাঁফিয়ে ওঠে।

বদ্যি ও ব্রাহ্মণমাত্রেই খারাপ লোক আমি কখনই বলব না। আমার সঙ্গে তারা শত্রুতা করলেও একথা বলব না তারা খারাপ। রাঢ়ীদের মধ্যে যেমন ভাল-খারাপ আছে বারেন্দ্রদের মধ্যেও আছে। জাত-পাত ধর্ম নিয়ে যারা বেশি মাথা ঘামায় তারা মানুষকেও জাত পাত ও ধর্মের তকমা পরিয়ে বিচার করে।

বিভিন্ন সিনেমায় ও নাটকে স্টিরিওটাইপ তৈরি করে মানুষের মনকে একমুখী করে দেওয়া হয়।

যেমন হিন্দি ছবিতে ভিলেন দেখাতে হলে একজন চ্যাপ্টা নাকের মঙ্গোলিয়ান ছাদের মুখের লোককে দেখানো হয়। ভারতীয় সিনেমার হিরোর চেহারা মেয়েলি, গোলগাল, কিন্তু বাস্তব জগতে এই ধরণের চেহারার যুবকেরা মোটেই মেয়েদের আকৃষ্ট করতে পারেনা। হিন্দি ছবিতে বোকাসোকা লোক দেখাতে গেলে এখন বাঙালিবাবু দেখানো হয়।

বাংলা নাটকে ভৃত্যরা হয় তোতলা না হয় কালা। তারা হাঁটুর ওপর ধুতি পরে। গায়ে থাকে বেনিয়ান। তারা গ্রাম্যভাষায় কথা বলে। কিন্তু আমি বাস্তবে কারও বাড়িতে গিয়ে অমন গৃহভৃত্য দেখিনি। গৃহভৃত্যরা আজকাল সমান মর্যাদার দাবিদার এবং তারা অনেকে টেরিলিন পরে।

আমাদের দেশে জাতপাত সূচক উপাধিগুলি তুলে দিতে পারলে অনেক ভাল হত। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা হত—জাতপাতের সঙ্গে জাতপাতের নয়।

॥ পাঁচ ॥
স্টিরিওটাইপ দেখে মানুষ বিচার করবেন না

আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে 'শাদির প্রথম রাতে মারিবে বেড়াল'। এ গল্পটি অনেকেই জানেন। যাঁরা জানেন না, তাঁদের নিবেদন করি।

একজনের গুরু উপদেশ দিয়েছিল। দেখো বৎস, জীবনে ফার্স্ট ইম্প্রেসানটাই হচ্ছে সব। তাই বউ এর কাজে ফার্স্ট ইম্প্রেসনেই যদি তুমি একজন কড়া ও রাগী লোক বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে না পারো, তাহলে কিন্তু বউ তোমাকে নিপাট ভালমানুষ ভেবে পেয়ে বসবে।

শিষ্য বলল, কী উপদেশ করেন গুরুদেব ?

গুরু বললেন, নিজের যা কিছু ইমেজ বিল্ড করার তা শাদির রাতেই করে ফেলবে। নয়তো সারা জীবনেও পারবেনা।

বিয়ের সময় শিষ্য এটি মাথায় রাখল। বিয়ে হয়ে গেল। ফুলশয্যার রাত। সম্বন্ধ করা বিয়ের ক্ষেত্রে ফুলশয্যার রাতটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। একথা সেকথার পর শিষ্য সর্বদা উশখুশ করছে কীভাবে প্রথম প্রভাবটি বউ এর মনে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। এমন সময় জানালা দিয়ে একটি বিড়াল লাফিয়ে পড়ল ঘরে। আর যায় কোথায় ? শিষ্য তখন দাঁত কড়মড় করে রেগে গিয়ে বেড়ালটাকে হাতহাত দিয়ে ধরল।

বেড়াল মারা

'তবে রে বেড়াল। আমাদের ডিসটার্ব করার আর সময় পেলিনা। 'এই বলে বেড়ালটার গলা এমন জোরে চেপে ধরল যে তার জিভ বেরিয়ে এল। তারপর বেড়ালটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে জানালা বন্ধ করে শিষ্য আবার স্বাভাবিক গলায় বলল, হ্যাঁ, যা বলছিলাম—নতুন বউ দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, তুমি বেড়ালটাকে মেরে ফেললে ? শিষ্য বলল, কী করব ? আমাকে রাগিয়ে দিল যে, আমি এমনিতে ভাল আছি। কিন্তু রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না। অমন কত মেরেছি। ওসব নিয়ে তুমি কিছু ভেবোনা। তুমি তো আর আমাকে রাগাচ্ছ না। বউ মনে মনে ভাবল, পাগল, আমি আর রাগাই।

বিড়াল মারার এই গল্পটি খুবই প্র্যাকটিক্যাল গল্প সন্দেহ নেই। প্রথম দর্শনেই যদি কাউকে নিপাট ভালমানুষ, বোকা সোকা বলে মনে হয় তাহলে লোকে তাকে পেয়ে বসে। বহু বোকা দেখতে লোক কিন্তু ভেতরে ভেতরে অনেক চালাক। কিন্তু তাদের বোকাসোকা মুখ ও সাদা সিধে অন্তরঙ্গ কথা বলার ভংগি দেখে লোকে তাদেরই ঠকাবার কথা ভাবে। কিন্তু নিজে ঠকে চলে আসে।

প্রথম দর্শনে যাদের ভালমানুষ নিরীহ বলে মনে হয় তারা তেমন ভালমানুষ ও নিরীহ নাও হতে পারে।

১. আপনার পরিচিত কোনও অফিসার সম্পর্কে আপনার ধারণা ছিল লোকটি খুবই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু একদিন কাগজে দেখলেন দুর্নীতির দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন, লোকটি ছিল প্রচণ্ড রকমের অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ।

২. অধিকাংশ খুনীর চেহারা কিন্তু সিনেমা থিয়েটারে দেখা খুনীদের মত নয়। একনজরে কোনও ছোটখাটো নিরীহ মানুষকে দেখে বুঝতে পারবেন না একদা ইনি নৃশংস ডাকাত ছিলেন। অথচ বাস্তবে এমন ঘটনা প্রচুর আছে। স্বদেশী ডাকাত বা রাজনৈতিক ডাকাত যাই বলুন না কেন যে কোনও ডাকাতি করতে গেলেই বুকের পাটা লাগে। কিন্তু যদি দেখেন, রোগা বেঁটে খুব নীরিহ চেহারার এক যুবক বিরাট বিরাট রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত তাহলে একটু অবাক হবেন। কারণ ডাকাতদের একটা স্টিরিওটাইপ আমাদের মনে তৈরি হয়ে গিয়েছে। নাটকে ডাকাতের ভূমিকায় কাউকে নামাতে হলে খুব বলিষ্ঠ কোনও লোক খুঁজবেন। তারপর তাকে মেকআপ দেবেন। দুগালে দোপাট্টা বিরাট গোঁফ, মাথায় বাবরি চুল। কিন্তু আমি চাকরি জীবনে পুলিশের হাতে যেসব ডাকাত ধরা পড়তে দেখেছি তারা অধিকাংশই সাধারণ চেহারার লোক।

৩. অনেকের ধারণা সৌম্য দর্শন প্রৌঢ় কিংবা সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগী 'বাবা'দের হাতে মহিলারা নিরাপদ। 'বাবা'দের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ হয় তাঁর একটা বড় অংশ মহিলা সংক্রান্ত। অথচ কাউকে যদি দেখতে একটু রাফ হয় লোকে সন্দেহ করেন যে লোকটি হয়তো দুশ্চরিত্র অথবা খল।

সাধুর প্রেম

অতএব মোদ্দা কথাটি হল আমাদের প্রথম দর্শনের ইম্প্রেসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচলিত স্টিরিও টাইপের বাইরে যেতে পারেনা।

আপনারা দেখবেন প্রথম দর্শনে লোকের প্রত্যাশা থাকে সপ্রতিভ চেহারা ঝকঝকে কথাবার্তা।

কোন ধরণের লোক কীরকম লোক পছন্দ করেন তারও স্টিরিওটাইপ আছে।

আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে বিয়ের ব্যাপারে কন্যা শুধু বরের রূপ চায়। (এখনকার মেয়েরা হয়তো নয়) কিন্তু মেয়ের মা চায় বিত্ত। ছেলে লেখাপড়া কতদূর শিখেছে বা বিদ্বান কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামায়না। যদি বড়লোকের ছেলে হয় তাহলে জামাই করার পক্ষে আদর্শ। ছেলে মোটা মাইনে পায় শুনলেই তিনি প্রথম দর্শনেই ইমপ্রেসড হয়ে পড়বেন। বাবা দেখবেন কুলশীল অর্থাৎ খানদান। কোন তরুণকে দেখে চট করে তাঁর খোঁজ নিতে ইচ্ছা করবে খানদান কী।

যদি শোনেন, নিচু জাত তাহলে হাজার সুদর্শন ও শিক্ষিত হোকনা কেন সে ছেলে প্রথম দর্শনে তাঁর মনে রেখাপাত করতে পারবে না।

মানুষের জীবনের চরম দুর্ভাগ্য যে প্রথম দর্শনের যে ছাপ অন্যের মধ্যে পড়ে সেটি এত বেশি প্রখর যে সারাজীবনে তা মুছে ফেলা যায়না।

হরিহরবাবু একজন বিখ্যাত সমাজসেবী। আপনি তার নাম শুনেছেন। কাগজে ছবি দেখেছেন। একদিন এক বারে আপনার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হল। তখন তিনি মত্ত অবস্থায় আছেন। আপনার সারাজীবন ধরে ইম্প্রেসন থাকবে যে হরিহরবাবু একজন মাতাল। হয়তো হরিহরবাবু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেদিনই মাত্র বারে গিয়েছেন। অথবা পরবর্তী জীবনে তিনি মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন বরং মদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। কিন্তু আপনার ইম্প্রেসন তাতে বদলাবে না। আপনার মালিক যেদিন প্রথম আপনার বিভাগ ভিজিট করতে আসবেন, সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন অথবা সেদিন ট্রেন লেট থাকার জন্য সময়মত হাজিরা দিতে পারলেন না। আপনার মালিকের মনে ধারণা হয়ে গেল আপনি একজন ফাঁকিবাজ। এ ধারণা সারাজীবন ধরেও যাবেনা।

অথবা আপনার বস আপনাকে প্রথম দিন একটা কাজ দিলেন। আপনি কাজটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে উঠতে পারলেন না। তারপর সারা জীবন ধরে আপনি যতই বড়বড় কাজ করে দিন না কেন আপনার সম্পর্কে বসের ধারণা হবে আপনি 'অকর্মণ্য'। আপনাকে দিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবেনা। স্কুলে শিক্ষকেরা এইভাবে ছাত্রদের ওপর প্রথম ইম্প্রেসন থেকে তাঁদের প্রিয় ছাত্রদের বেছে নেন। যাঁদের পছন্দ করেন না তাঁদেরও এইভাবে বাছা হয়। সাধারণত মুখচোরা, পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা শিক্ষকদের বিরাগভাজন হয়। আর এই বিরাগের শিকড় এত গভীরে চলে যায় যে তারা চেষ্টা করেও শিক্ষকদের নেকনজর আদায় করতে পারেনা। কর্মক্ষেত্রেও এমন ঘটনা আকছার ঘটে। সমস্ত বৈষম্য

ও ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দ লাগার কোনও বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা থাকেনা। তবে প্রথম ইম্প্রেসন যে মতামত গড়তে অনেকখানি কাজ করে এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এই 'ফার্স্ট ইম্প্রেসন' সম্পর্কে তরুণ তরুণীরা অধিকতর সজাগ। কারণ তারা তখন সমাজ জীবনে প্রবেশ করছে। লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করাই তখন তাদের প্রধান কাজ।

সেজন্য তরুণ তরুণীরা এই বয়সে পরস্পরকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা ফ্যাশন করে। নিত্য নতুন সাজগোজ করে। সাজগোজের উদ্ভবই নারীপুরুষের পরস্পরকে আকৃষ্ট করার জন্য। এইজন্যই পাত্রপাত্রী দেখানোর দিন বা বিয়ের দিন পাত্রপাত্রী দুজনেই বেশি করে সাজগোজ করে যায়। স্মার্ট বলে ইম্প্রেসন দেবার জন্য ইন্টারভিউতে অনেকে ধার করা কোটপ্যান্ট পরে যান।

প্রথম আলাপে নিজেকে জাহির করার জন্য অনেকে নিজের সম্পর্কে বড় বড় কথা বলতে থাকেন। যাকে বলে ওভারস্মার্ট বা ওভার চালাকি করার চেষ্টা করেন অনেকে।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

১. পাড়ায় নতুন বাড়ি করে এসেছেন এক ভদ্রলোক। প্রতিবেশীর গিন্নী তাঁর গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। দুজনেই দুজনকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছেন।

প্রতিবেশীর গিন্নী। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। নতুন এসেছেন। কিছুদিন ধরেই ভাবছি যাবো যাবো, কিন্তু কিছুতেই সময় করে উঠতে পারিনা। আমরাও এখানে বেশি দিন আসিনি—বাড়ি করা ইস্তক সব আত্মীয় স্বজনরা দেখা করতে আসছে। এই সেদিন আমার দেওর ও ভাজ আমেরিকা থেকে এল। দেওর নিউজার্সির বড় ডাক্তার। আমার কর্তাই ওকে পড়িয়েছে। আর জি কর থেকে পাশ করেছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে আরও ডিগ্রি নিয়ে বিরাট হয়েছে। বছরে দুবার আসে। অন্যবার গ্র্যান্ডে ওঠে। এবার ওর দাদা বলল, বাড়ি করেছি, আর গ্র্যান্ডে থাকা চলবেনা—তা আপনারা আগে কোথায় থাকতেন ভাই।

নতুন বাড়ির গিন্নি। আমার কর্তারতো বদলির চাকরি ছিল। বিশাল বিশাল বাংলোয় থেকেছি। এখন রিটায়ার করেছেন। জীবনে প্রথম এই ছোট বাড়িতে থাকছি। তবে দুই ছেলে, তারা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে। একজন বাঙ্গালোরে, আর একজন দিল্লিতে। বুড়োবুড়ি থাকবো। উনি বলেন, বড় বাড়িতে আর দরকার কি আমাদের ? এইতো নিচে ওপরে মিলিয়ে আটখানা ঘর—কেইবা থাকছে। আমেরিকার বোস্টনে আমার ভাইও থাকে—ওখানে একটি কম্পানি চালায়। খুব নাম করেছে। ওর সম্পর্কে স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল—আপনার দেওর হয়তো চিনতে পারেন।

ঃ আপনার বাড়ির মোজাইকটা খুব ভাল দিয়েছে। আমায় অনেকে বলল,

মোজায়েক বসাতেও যা খরচ স্পার্টেক বসাতেও তাই। বরং ঝামেলা কম। আমি স্পার্টেক বসিয়ে দিলাম। তেত্রিশ টাকা স্কোয়ার ফুট নিল—যা গলাকাটা দাম।

ঃ স্পার্টেকের চেয়ে মার্বেলই ভাল। আমরা বাথরুম গুলো মার্বেল করেছি, খুব একটা বেশি পড়েনা। বাড়িতো একবারই করবো। তা আপনাদের এ পাড়ায় জিনিষপত্রের যা দাম—আমাদের লাস্ট পোস্টিং ছিল বাঙ্গালোরে। দিনে তিন চারশ' টাকায় আমাদের হেসে খেলে কাঁচা বাজার হয়ে যেত। এখানে ঠিক হাজার টাকা লাগছে।

ঃ আর বলবেন না, জিনিষপত্রের যা দাম—গলদা চিংড়িতো ছুঁতে পারবেন না, তিনশো টাকা কিলো। মাসে একদিনের বেশি খাওয়া সম্ভব নয়।

ঃ আমরাতো আবার দীক্ষিত। মাংস পেঁয়াজ চলে না। মাছটা আনতে হয়। কর্তা আজকাল চালাক হয়ে গেছেন দুতিন কেজি গোটামাছ নিয়ে আসেন। ফ্রিজে রেখে সারা হপ্তা খাই।

প্রথম আলাপে এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করার নজির হুবহু দেওয়া যায়। অনেকে প্রথম আলাপে জানিয়ে দেন, তিনি একজন বিখ্যাত লোকের আত্মীয়।

আমার কাছে কিছুদিন আগে একটি ছেলে এসেছিল একটা ছবি করার ব্যাপারে আলোচনা করতে। ছেলেটি এমন করে কথা বলল যে সে যেন এখনই ছবিটা করে ফেলবে। শুধু মনোমত গল্প, অভিনেতা অভিনেত্রী আর প্রয়োজনীয় টাকা পাচ্ছে না বলে ছবিটা করতে পারছে না। ছেলেটি আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের ভাগ্নে বলে পরিচয় দিল।

কিন্তু তার মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম একদিন তার ভাগ্নেকে সে চিনতেই পারল না।

প্রতারকেরা প্রথম ইম্প্রেসনে বিশ্বাস জন্মাবার নানা টেকনিক জানে। তারা কীভাবে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয় তার টেকনিক জানে। তারা এক একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ভাবের ঘরে চুরি করেন না কি! তিনি যা নন, সেটাই প্রথম দর্শনে অন্যের মনে ফুটিয়ে তুলতে চান।

বিয়ের কনে দেখতে এলে অনেক ক্ষেত্রে কনেকে বেশি কথা বলতে বারণ করা হয়। কারণ অনেকে কথা বলার সময় সত্য গোপন করতে পারেনা। এর ওর বাড়ি থেকে ছবি, সেলাই এর কাজ, এনে পাত্রীর নিজের হাতের কাজ বলে চালানো হয়। নানা লোকের রান্না পাত্রীর নিজের রান্না বলে চালানো হয়।

স্টিরিওটাইপের সঙ্গে প্রথম ইম্প্রেসন যাতে মেলে তারজন্য বহুলোক ইচ্ছা করেই নিজের সাজগোজ স্টিরিওটাইপের মত করে তোলেন। ভণ্ড ধার্মিক বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করার জন্য ফোঁটা কাটে ; অনেকে গলায় রুদ্রাক্ষ পরে। কবি অভিনেতা ও শিল্পীরা বড় বড় চুল রাখে। পলিটিসিয়ানরা খদ্দরের হাইকলার

পাঞ্জাবি আর পাৎলুন পরে। অলীক ব্যক্তিত্ব আনার জন্য অনেকে পাইপ ধরে। অথচ শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্যান্ট শার্ট পরেই এযুগের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেলেন। জ্যোতিবসুকে হাইকলার পাঞ্জাবি আর পাৎলুন পরতে হয়নি—পাইপও ধরতে হয়নি ব্যক্তিত্ব আনার জন্য। **ফার্স্ট ইম্প্রেসন নয় লাস্ট ইম্প্রেসন নয়—লাস্টিং ইম্প্রেসন বা দীর্ঘস্থায়ী ভাবমূর্তিই প্রকৃত ভাবমূর্তি।**

যে মানুষ প্রতিদিন এক থাকেন, অর্থাৎ মানুষ হিসাবে খুব বেশি বদলান না, তিনিই খাঁটি চরিত্রবান মানুষ। কিন্তু কেউতো খাঁটি মানুষের সম্মান করেনা। কেউ মানুষকে বিশ্লেষণও করেনা, তারা শুধু কল্পিত স্টিরিওটাইপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

॥ ছয় ॥
নামে কী আসে যায় ?

কথায় আছে আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী। কিন্তু দর্শন দিয়ে যে গুণ বিচার করা যায়না সেকথা আগেই বলেছি। অনেকে দর্শন কেন নাম দিয়েই মানুষের গুণ বিচার করতে শুরু করেন। ধরুন দুটি ছেলে চাকরিব দরখাস্ত করল কালীপ্রসন্ন পতিতুণ্ড ও উত্তীয় রায়। আপনি কাকে মনে মনে সমর্থন করবেন ? দুটি মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হচ্ছে, একজনের নাম মিনতি সমাদ্দার, আর একজনের নাম রাত্রি সেন। আপনি কোন মেয়েকে পছন্দ করবেন ? আপনি নিশ্চয়ই উত্তীয় রায় ও রাত্রি সেনকে পছন্দ করবেন ? পছন্দ করবেন শুধু নাম দেখে। কোন নাম দেখে আপনার মনে হবে লোকটি খুবই ধড়িবাজ। কোন নাম দেখে মনে হবে লোকটি বোকা। কোন নাম দেখে মনে হবে লোকটি সেকেলে। কোন নাম দেখে মনে হবে ঝকঝকে বুদ্ধিদৃপ্ত চেহারা।

অথচ বাস্তবে নামের সঙ্গে প্রতিভার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু অনেকে নাম দিয়ে মানুষ চিনতে চান। তাঁরা ভাবেন, কালীপদ, হরিপদ জগন্নাথ প্রভৃতি নাম মানেই 'সেকেলে নাম,' এই নামের লোকেরা একদম চালাক চতুর হয়না। কিন্তু কালীপদ নামে আমি অনেক অধ্যাপককে দেখেছি। উনিশ শতকের কালীপ্রসন্ন সিংহদের কথা বলছিনা বা এই শতকের গোড়ার দিকের কালিদাস রায়ের কথাও বলছি না। আমি ৪০/৪৫বছরের যুবকদের মধ্যেও কালীপদ নাম পেয়েছি। জগন্নাথ নামেই বিখ্যাত হয়েছেন তরুণ আবৃত্তিকার জগন্নাথ ঘোষ। অথবা কিছুকাল আগে প্রয়াত কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী। শচীকান্ত নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুব আধুনিক বলে মনে হয় না হয়তো। কিন্তু বিচারপতি শচীকান্ত হাজারি আধুনিক মনস্ক এক কৃতী বিচারপতিই ছিলেন।

অনেকের ডাক নামটা আসল নামের চেয়েও জনপ্রিয় হয়ে যায়। দেখা যায়, ডাক নাম ও আসল নামের সঙ্গে আকাশপাতাল ফারাক। ডাক নাম হয়তো হাবু কিন্তু ভাল নাম তমাল কিংবা সূর্য অথবা রাজর্ষি, কিংবা পূষণ। পুঁটে বা খুকি নামের অন্তরালে হয়তো সুতপা, অন্তরা, সুদর্শনা, শ্রবণা কিংবা উত্তরা নামধারী কোনও আধুনিকা রয়েছে। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অমন সুন্দর পোশাকি নাম সম্পর্কে আগ্রহী নয়। তারা ডাকা নাম ধরে ডাকাই পছন্দ করে। কিন্তু বাইরের লোক যিনি নামধারীকে চোখে দেখেননি, তাঁর কাছে খেদুবাবু কিংবা খেতন বাবু বললে কোনও ব্যক্তিত্বশালী মার্জিত, বিদগ্ধ পুরুষের ছবিই শুধু ভেসে ওঠে, কিন্তু যদি তাঁদের পোশাকিনাম কিশোর কিংবা ক্ষেত্র বলা যেত তাহলে চোখের সামনে হয়তো একটি পুরো মানুষের অবয়ব ফুটে উঠত। এজন্য অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ডাক নাম গোপন রাখতে চান। কিন্তু আবার লোকটি পাড়ায় জনপ্রিয় হয়ে গেলে ডাকনামেই তার নাম ডাকা হয়ে যায়।

নামের সঙ্গে চেহারা বা গুণের কোনও মিল থাকার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু জনসাধারণ নামের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন সেহেতু বাবা মায়েরা ছেলেমেয়েদের নামকরণের ব্যাপারে আর একটু মৌলিকতা ও আধুনিকতার পরিচয় দিতে পারেন না। কারণ এনাম এমন একটি পিতৃদত্ত বস্তু যা সন্তানকে চিরকাল বহন করে নিয়ে বেড়াতে হয়।

অনেক সময় উদ্ভট, অতিসেকেলে ও গতানুগতিক নাম হলে স্কুলজীবন থেকেই ছেলেমেয়েদের সহপাঠীদের হাসি ঠাট্টা, বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। যেমন হয়তো কারও নাম পাঁচু, তাঁকে বন্ধুবান্ধবরা পেঁচো বলে ডাকবেই। অথচ নামের কনোটেশন কীভাবে বদলে গেল। পঞ্চানন অর্থে শিব। তার বিকৃত রূপ পাঁচু। তারও বিকৃত রূপ পেঁচো। মদন বন্ধুবান্ধবদের মুখে হয়ে ওঠে মদনা। জগন্নাথ—জগা।

নাম যাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের আমি কর্মজীবনে নাম বর্জন করে শুধু আদ্যক্ষর ব্যবহার করতে দেখেছি। যেমন কালীপ্রসাদ চৌধুরী—কে পি চৌধুরী, হরিপ্রসাদ মহলানবীশ, এইচ. কে. মহলানবীশ। পাঁচুগোপাল মুখার্জি—পি. জি. মুখার্জি। মেয়েরা কিন্তু খুব কমই নামের আদ্যক্ষর ব্যবহার করেন। কর্মক্ষেত্রে একটা সুবিধা তাঁদের আছে, যেমন হরিবাবু, কালীবাবু বলে পুরুষদের লোকে ডাকে, মহিলাদের ক্ষেত্রে নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ নেই। তাঁরা কর্মক্ষেত্রে মিসেস বা মিস ঘোষ, সেন, রায়, মুখার্জি, দত্ত, আসরাফ, সিদ্দিকি নামেই পরিচিত হন। অনেক মহিলাকে নির্বিবাদে স্বামীর পুরো নামটা বলে পরিচয় দিতে শুনেছি—আমি মিসেস রণধীর কাপুর অথবা মিসেস আসরাফ সিদ্দিকি, অথবা মিসেস সুনীল চৌধুরী। অবশ্য এভাবে পরিচয় দেওয়া হয় তখনই যখন স্বামীদের সোসাইটিতে পরিচয় এক ডাকেই।

তবে নাম থেকে লোকটি কেমন চরিত্রের বা কেমন চেহারার তা অনমান না করাই ভাল। তরুণ একদিন প্রবীণ হবেই, তখনও তার নাম থাকবে তরুণ। প্রিয় নাম যার ব্যক্তিগত জীবনে সে হয়ত ভীষণ অপ্রিয়।

কিন্তু নামের মধ্যে দিয়ে পারিবারিক সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার একটা ছাপ পাওয়া যায়।

যাঁরা প্রচলিত সাধারণ নাম রাখেন তাঁদের মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারার ছাপ নেই। তাঁরা সাধারণ মানুষ। সাধারণের মত জীবন যাপন করতেই অভ্যস্ত। তাঁরা ছেলের নাম রাখেন সন্তোষ, রতন, জীবন, চঞ্চল, অনিল, শ্যামল, বিমল ইত্যাদি। মেয়েদের নাম রাখেন—রমা, মীরা, কল্যানী, শ্যামলী, বৈশাখী, গীতা ইত্যাদি।

যাঁরা ধর্মপরায়ণা তাঁরা এখনও দেবতার নামের সঙ্গে নাম রাখেন। আবার তার মধ্যেও আধুনিকতা আনার চেষ্টা করা হয়। পরমেশ্বর, মহেশ, গণপতি, কার্তিক, মেয়ের নাম সারদা, লক্ষ্মী, দুর্গা, শ্যামা এখনও সেই ট্র্যাডিশন চলছে।

আজকাল বাংলাদেশে অনেক মুসলমান অমুসলমানি নাম রাখছেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি বেশি করে হচ্ছে—ইরা, রেবা, মেঘনা, পম্পা, মীরা এসব নাম ঢাকা চট্টগ্রামে প্রচুর পাওয়া যাবে। নামের শেষে ইসলামি উপাধি দেখে বুঝতে হবে ধর্ম। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা এখনও ইসলামি নাম ব্যবহার না করে প্রাচীন হিন্দু নামই ব্যবহার করে আসছেন। ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির ভেতর সর্বাঙ্গীণ মিশ্রণ ঘটায় ওদেশে কোন সাম্প্রদায়িক টেনশনের কথা শোনা যায়না। নাম ও পদবির মধে ভারতীয়রা যদি সংহতি দেখাতে পারতেন তাহলে অনেক টেনসন কমে যেত। যেমন কিছু কিছু সমঝোতা তালিকা করা যায় প্রথম নামের। বাঙালি মুসলমানেরা যদি অজিত, অরুণ, রবি, কিরণ, শশী এইসব সেকুলার বাংলা নাম গ্রহণ করেন তাহলে আরবি নামের চেয়ে সেটি বুঝতে সুবিধা হয়। আবার বাঙালি হিন্দুমেয়ের নাম যদি মমতা না হয়ে মমতাজ হয় তাহলে এমনকি ক্ষতি হয়। দেশি খ্রীষ্টানরা তাদের পোশাকি নাম বদলাননি, এজন্য তাঁদের ভারতীয় সমাজে একাত্ম হওয়া খুব সহজ হয়েছে।

আবার হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য 'সার নেম' বা টাইটেল আছে, এইসব টাইটেল বা পদবি যেহেতু জাতপাতের পরিচয় বহন করে অথবা কৌতুক উদ্রেক করে, তাই এই উপাধিগুলি পরিবর্তন করা দরকার। হাটি, কুমির, গুঁই, কাপাট, রুইদাস, কায়পুত্র, বাউরি, এই ধরণের অসংখ্য টাইটেল বদলে রায় বা দাস বা বিশ্বাস করা যায়। দেশে সর্বাগ্রে একটা আইন হওয়া দরকার সেই আইনের উদ্দেশ্য হবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় তাঁর পদবি বর্জন করতে চান তিনি হলফনামা দিয়ে বর্জন করতে পারবেন। নেহরু কিংবা গান্ধী তাদের পদবি ছাড়তে পারেননি কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ন বা শ্রীমন নারায়ন, পিয়ারিলাল, উদয়শংকর, রবিশংকর থেকে সিনেমা লাইনের সব কুমারেরা অক্লেশে পদবি ছেড়েছেন। আসলে পদবির সঙ্গে জড়িয়ে

থাকে কুলশীলের অহংকার যা থেকে হিন্দুদের মত মুসলমানেরাও মুক্ত নন। তাঁরাও নামের আগে সৈয়দ শেখ নামের শেষে চৌধুরী সরকার প্রভৃতি খেতাব ব্যবহার করেন। অথচ মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা এত শ্রেণীহীন ছিল যে বাবার পদবি বা নাম ছেলেমেয়েরা গ্রহণ করত না। জাফরউল্লার ছেলে অক্লেশে ওমর আলি হতে পারত। কিন্তু ইংরাজি কায়দায় অনেক আলি বংশানুক্রমিক আলি হয়ে গেছেন। শেখের ছেলেও শেখ হচ্ছেন। সৈয়দের ছেলেও সৈয়দ।

আমি অনেক হিন্দুকে বিদ্যাসূচক উপাধি সরস্বতী বংশানুক্রমে গ্রহণ করতে দেখেছি। এককালে বিদ্যার্জন করে বংশের কেউ সরস্বতী উপাধি পেয়েছিল, তার ছেলে এবং মূর্খ নাতিও সরস্বতী লেখে। এককালে নবাবের সৈন্যবাহিনীতে তোপ দাগতেন যিনি, তিনি তোপদার উপাধি পেতেন অথবা যিনি গ্রামে মোড়ল ছিলেন, তিনি হতেন মণ্ডল, যিনি নিয়োগকর্তা বা ম্যানেজার তিনি হতেন নিয়োগী, কিন্তু এইসব পদবিতো পরবর্তী প্রজন্মেই অচল হয়ে পড়ে। এখন সেটি হাস্যকর ঠেকে, এক সময় গুণ ও কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন পদবির একটা অর্থ ছিল। পদবি দিয়ে গুণ ও কর্ম চেনা যেত। কিন্তু এখন যে মুচির কাজ করছে (জুতোর কারখানায় কাজ করছে) তার উপাধি পুরোহিত। কিন্তু একজন চণ্ডাল ভাল সংস্কৃত শিখে উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করলেও সে চণ্ডালই থেকে যাবে। এটা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

এখন যা পরিস্থিতি তাতে নাম পদবি দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, কুলশীল, জনপ্রিয়তা লিঙ্গ বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত ইত্যাদি বোঝানো হয়ে থাকে। এই বোঝা অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝা। অতি সাধারণ প্রচলিত নাম যাদের, তাঁদের আমরা সাধারণ মানুষ বলেই ভাবি। আবার একটু অপ্রচলিত নাম হলে ভাবি খুবই রুচিবান সুদর্শন। পূষণ, নচিকেতা, সত্যকাম, অথবা নিলয়, সৈকত, অনিকেত, নামের ছেলেরা সব সময়েই যে জীবনে কৃতী হবে তার কোনও মানে নেই। এমনকি তারা কেউ জড়বুদ্ধিও হতে পারে। এলা, সাগরী, তৃষা, তৃণা, রীণা, এষা, কলাপী, মন্দা, এই নামের সব মেয়ে সুন্দরী এবং সুরসিকতাও নানা কলায় পারদর্শী হবে তার কোনও মানে নেই। তবে হ্যাঁ, এক একটি অপ্রচলিত সুন্দর নাম শুনলে মনে হয় ছেলে বা মেয়েটির বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ সুন্দর। অধিকাংশ পরিবারে দায়সারা ভাবে একটি নাম রাখা হয়। এই পরিবার অন্তত ভাবনা চিন্তা করেছে। এ ব্যাপারে সাহিত্যিক বা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নামকরণে কিছুটা ইনোভেশনের বা উদ্ভাবনের স্বাক্ষর রেখে যান। যেমন ঐতিহাসিক মাখনলাল রায়চৌধুরী তাঁর মেয়ের নাম রেখেছিলেন মন্দাক্রান্তা, প্রমথ বিশী তাঁর মেয়ের নাম রাখেন চিরশ্রী।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেমেয়ের নাম শাদামাটা রেংখছিলেন। মহুয়াতে অত সুন্দর সুন্দর নাম আছে—প্রতিটি নামের মেয়েদের রূপের বর্ণনাও আছে

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার একটিও নিজের মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি। তাহলে মীরা না রেখে তাঁর মেয়ের নাম তিনি রাখতেন মহুয়া অথবা সাগরী।

তবে ইউনিসেক্স নামের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভ্রান্তি হয়। ঊষা, উমা, কালী, শান্তি, শ্যামা, পুষ্পিতা, রমণী, গৌরী এই সমস্ত নাম পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই হতে পারে। এইসব নাম সমাস বদ্ধ করে পুরুষ নাম করা হয়। যেমন শান্তি—শান্তিপ্রসাদ, শান্তিপদ, পুষ্পিতা—পুষ্পিতারঞ্জন, ইত্যাদি। কিন্তু মধ্যপদলোপ পেয়ে গেলেই মুশকিল। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে গৌরীদত্ত বা শান্তি মিত্র এই নামে চিঠি পেয়ে অনেক রোম্যান্টিক প্রেমিক নারী মনে করে অনেক আশা নিয়ে দেখা করতে গিয়ে দেখেন, তাঁরা গুঁফো পুরুষ মানুষ। আগে মেয়ের নামের আগে মিস্ বা কুমারী লিখত—এখন সবাই এমএস। সিঁথিতে আগে লাল সিঁদুরের বিপদজ্ঞাপক সংকেত থাকত এখন যেন সেটাও উঠে যাচ্ছে। এর ফলে ভুলবোঝাবুঝি সৃষ্টিতে লাভ বা ক্ষতি যেটুকু হচ্ছে তা মহিলাদেরই হচ্ছে।

আধুনিক অনেক মনস্তত্ত্ববিদ (যাঁদের মধ্যে হার্টম্যান প্রমুখেরা পড়েন) বলেন, ছেলেমেয়েদের নাম দেবার সময় একটু চিন্তা করে দেবেন। নামের সঙ্গে সঙ্গে নামকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। পুরুষের মেয়েলি নামের (রমণী, পুষ্পিতা, রজনী ইত্যাদি) সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলায় তাদের ব্যক্তিত্বও মেয়েলি হয়ে যায়।

নাম হবে সহজ সরল যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জিত এবং দুটি বা তিনটি শব্দের। অথচ অপ্রচলিত। মকরাক্ষ, নলিনাক্ষ, পুরঞ্জয়, বীভৎসু, এইসব নামের উচ্চারণ ও বানানে ভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক। অর্থহীন, বিদঘুটে নাম কারও ওপর চাপানো উচিত নয়। তাহলে নাম চাপা পড়েই তার মৃত্যু হবে।

॥ সাত ॥
মানুষ সব সময় অভিনয় করছে।

মানুষ চেনার সবচেয়ে বড় মুশকিল হচ্ছে সব মানুষই অভিনয় করতে পারে, অন্যকোনও প্রাণী পারেনা। মানুষ কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। এই রাগে ফেটে পড়ছে। পরক্ষণেই গলে জল হয়ে যাচ্ছে। এই ভক্তিতে গদগদ হয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তেই তাকে গালাগাল দিচ্ছে।

রামশ্যামকে ঘৃণা করে। কিন্তু একদিন শ্যামের মৃত্যুতে রাম ভেউ ডেউ করে কাঁদতে লাগল। হয়তো রাম অনুতপ্ত তাই কাঁদছে। নয়তো না কাঁদলে ভাল দেখায় না। শ্যামের লোকজনের কাছে দরদী সাজার দরকার হয়েছে। এটি হয়তো কুম্ভীরাশ্রু।

কিন্তু কান্না দেখে সবাই ভাববে সত্যিই তো কী দরদ। আমি দেখেছি অনেক

অফিসারকে। অধস্তনদের ধমকাচ্ছেন। খুব বাজে ভাষায় কথা বলছেন। কিন্তু মন্ত্রীর ফোন এল। অমনি রাগ কোথায় উবে গেল। হাসি হাসি মুখ করে মোলায়েম গলায় তিনি বলতে শুরু করলেন, 'বলুন স্যর বলুন স্যর, আমি দত্ত বলছি স্যর। আপনার শরীর কেমন আছে স্যর ? প্রেসার নর্মাল ? হ্যাঁ স্যর, হ্যাঁ স্যর....'

অধিকাংশ মানুষই মুখে একরকম, কাজে একরকম। এজন্য মানুষের আসল পরিচয় জানা খুব মুশকিল। যদি না কারও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকে। প্রত্যেকটি লোক যেন মুখে এক একটা করে মুখোশ পরে বাইরে বেরোয়। মুখোশকে গ্রীক ভাষায় বলে 'পার্শোনা', 'পার্শোনালিটি' অর্থে ব্যক্তিত্ব। মুখোশ পরে কেন ?

না, আমি যা-তা যেন পাঁচজনের সামনে না ধরা পড়ে।

অনেকদিন আগে একটি বইতে পড়েছিলাম মানুষের তিনটি রূপ। তিনি যা। তিনি অন্যের চোখে যে ভাবে প্রতিভাত হতে চান আর তাঁর প্রকৃত চেহারা।

যেহেতু প্রথম দর্শনেই একজনের চরিত্র বিচার করার প্রবণতা মানুষের দুর্বলতা, সেজন্য প্রথম দর্শনেই নিজের আসল চরিত্রটা ঢাকার চেষ্টা করে অনেকে। সেদিক থেকে অনেক মানুষই এক একটা পাকা প্রতারক। তারা যা নয়, তা বোঝাবার চেষ্টা করে অন্যকে। অন্তত বহুলোকই ভদ্রলোক নয়, কিন্তু তারা সবাই ভদ্রলোকের মত ধোপদুরস্ত পোশাক পরে রাস্তায় বেরোয়। জেলখানার কয়েদীদের মধ্যে সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে তাদের অধিকাংশকেই ভদ্র সভ্য মার্জিত সাধারণ মানুষ বলে মনে হত। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের নানা ত্রুটি বিচ্যুতিকে পোশাক ও কথাবার্তা দিয়ে ঢাকি।

মনের ভাব গোপন করি ভাষা দিয়ে। এমনকি আমরা যখন ক্ষমতা পেয়ে হাতে মাথা কাটি, যখন হম্বিতম্বি করি তখন বুঝতে হবে কোথাও গোলমাল আছে আমাদের চরিত্রের মধ্যে। যে শাশুড়ি এক সময়ে বউ হয়ে এসে শাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করেছিলেন, অনেক সময় তিনি শাশুড়ি হলে তাঁর ছেলের বউ এর উপর দ্বিগুণ অত্যাচার করে নিজের অপমান উশুল করেন। বড়বাবু অফিসারের কাছে গালি খেয়ে এসে কেরানীদের উপর দ্বিগুণ করে সেটি ঝাড়েন। অনেকে অফিসে নীরবে অপমান সহ্য করে বাড়িতে এসে ছেলেমেয়ে বউএর উপর চেঁচামেচি করে তাঁর শোধ তোলেন।

অনেকে দেখবেন নিজের সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলেন, দেখে নেবো, একটা একটা করে শেষ করে দেবো, হু হু বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি করে কেউ পার পায়নি। আমি ভালর ভাল, মন্দর মন্দ। অমুককে আমি বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়েছি।

রামকৃষ্ণদেব একেই বলেছেন, 'ফোঁস করা', কিন্তু মনে রাখবেন যে সাপ বিষধর হিংস্র, তারা ফোঁস করেনা, একবারেই ছোবল দেয়। ফোঁস করে তারাই যারা দুর্বল, ভেতরে ভেতরে যারা জানে, কুলোপানা চক্র দিয়ে তারা যেটুকু ভয় দেখাতে পারে তার বেশি তাদের ক্ষমতা নেই। ফোঁস করা দুর্বলের আত্মরক্ষার প্রবণতা। অথবা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোনও বিকার।

একজন লোক কাউকে প্রকাশ্যে ছোট করে, গালাগালি দিয়ে, অসভ্য, অভদ্র ইতর মন্তব্য করে নিজের অবচেতন মনের ঈর্ষা, অপারগতা ও হতাশার প্রতিফলন ঘটায় মাত্র। কিন্তু সচেতনভাবে সে এটা করে অন্যের কাছে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য। অন্যলোক তাকে বলবে, দেখেছ, কী বুকের পাটা, অতবড় লোকের বিরুদ্ধে গালি পাড়ছে।

অনেকে হয়তো আপনাকে মাঝে মাঝে এসে বলেন, অমুক লোক আপনাকে খুব গালাগাল দিচ্ছিল। আপনি বুঝতে পারেন না এর কারণ কি! কারণ হল, আপনার কোন গ্রুপ নেই। আপনি ছাপোষা লোক, চিরকাল শুধু নিজের কাজটুকু করে গিয়েছেন। আপনার কিছুটা নাম হয়েছে। পরিচিতরা সেটি সহ্য করতে পারছে না এই জন্যই লোকে যতখানি সম্ভব পরিচিতদের নিয়ে গ্রুপ বা গোষ্ঠী তৈরি করে। তাতে কিছু লোককে নিজের পক্ষে আনা যায়। বিখ্যাত ব্যক্তিরা এজন্য চামচা তৈরি করেন। কারণ চামচারা তাঁদের হয়ে পজিটিভ প্রচার করবেন। আমাদের দেশে নিরপেক্ষভাবে লোকে দোষগুণ বিচার বিশ্লেষণ করে না। হয় কাউকে দেবতা বানায়, না হয়, দানব বানায়। এই দুধরণের ইমেজই শত্রু ও মিত্র স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচারের নীট ফল। ঘুরে ফিরে আবার স্টিরিও টাইপের কথায় ফিরে আসি। কারণ স্টিরিওটাইপের ফলে মানুষের মনে যেমন লোক চরিত্র সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, তেমনি স্টিরিওটাইপের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য মানুষ ক্রমশ খাঁটি মানুষ না হয়ে মেকি মানুষে পরিণত হয়। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি।

স্টিরিওটাইপের ফলে মানুষ সম্পর্কে মানুষের যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় একথা আগেই বলেছি। জাতি বিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ সমস্তই স্টিরিও টাইপের দ্বারা সৃষ্টি। আর এই স্টিরিওটাইপ তৈরি হয় সাহিত্য, সিনেমা, টেলিভিশন মারফৎ। আগে মুখে মুখে নানা সংস্কার প্রচারিত হত। কিন্তু এখন সিনেমা ও টেলিভিশনই বিভিন্ন স্টিরিওটাইপ মারফৎ এক এক ধরণের চরিত্র সম্পর্কে এক এক রকম ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল করে দিচ্ছে। আগেকার স্টিরিওটাইপ পালটে নতুন স্টিরিওটাইপ গড়ে উঠছে। যেমন সিনেমা ও টেলিভিশনে ও প্রচার মাধ্যমে বারবার প্রচার করার ফলে সুখী পরিবারের স্টিরিও টাইপ গড়ে উঠছে একটি কি দুটি ছেলেমেয়ে। তিন চারটি ছেলেমেয়ে যাদের তারা উপহাসের পাত্র।

২. সিনেমায় দেখানো হয় মোটাসোটা লোকেরা সাধারণত বোকা।
৩. বয়স্ক ও বৃদ্ধ বাবারা ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছা বিবাহ প্রথমটা মেনে নেননা। প্রবল প্রতিবাদ করেন, কিন্তু শেষে মেনে নেন।
৪. পরিবারের শাশুড়ি, শ্যালক অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ির লোকেরাই নানা অশান্তির কারণ।
৫. শিক্ষকেরা দরিদ্র, অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও নির্লোভ।
৬. ডাক্তাররা সমাজসেবার জন্যই এই পেশাকে বেছে নিয়েছেন। কিছু কিছু ডাক্তার আছেন যারা ব্যতিক্রম মাত্র।
৭. ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা অসাধু তারা রাজস্থানের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক।
৮. বাঙালি ব্যবসায়ীরা কেউই অসাধু নয়—শুধু তারা ব্যবসার কৌশল জানেনা।
৯. একমাত্র ধনীর সন্তানরাই জেদী একগুঁয়ে এবং পরনির্ভর।
১০. ইংরাজি-মাধ্যম স্কুলে পড়া ফরফর করে ইংরাজি বলতে পারা ছেলেমেয়েরাই একমাত্র স্মার্ট বুদ্ধিমান।
১১. গ্রামে অবস্থাপন্ন জমির মালিকেরা লম্পট অত্যাচারি ও সুদখোর।
১২. চাষীমাত্রই গরিব এবং শোষিত।

রাজনৈতিক নেতারাও ক্রমাগত প্রচারের ফলে কতগুলি স্টিরিওটাইপ তৈরি করেন, যেমন ক্রমাগত প্রচারের ফলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে স্টিরিওটাইপ গড়ে উঠেছে

১. যারা বামফ্রন্ট বিরোধী তারা সবাই প্রগতি বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল।
২. যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী হিন্দু এবং নিয়মিত ধর্মাচরণ করে তারা মৌলবাদী, প্রগতিবিরোধী।
৩. যুক্তিবাদের প্রতি আস্থা, সেকুলার-তন্ত্রে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান-মনস্কতা যেসব ব্যক্তির আছে তারা অবশ্যই নিরীশ্বরবাদী ও বামপন্থী।

প্রচলিত স্টিরিওটাইপ মানে কতগুলি ভাবমূর্তি। ভাবমূর্তি যখন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বর্তায়, তখন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে ওঠে। তার ফলে একটি ভাল প্রতিষ্ঠানের সবই ভাল।

আমাদের মধ্যে ধারণা যে বিদেশী বা ফরেন জিনিস একেবারে খাঁটি। কিন্তু বিদেশে বহু জিনিসই ঠুনকো। আমি যত বিদেশী জিনিস আনিয়েছি সেগুলি একটাও বেশি দিন টেঁকেনি।

বহুলোকের ধারণা শাদা চামড়ার লোকেরা সৎ, বুদ্ধিমান পরিশ্রমী কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে অপরাধ পশ্চিমী দেশের তুলনায় ভারতে অনেক কম। একজন ভারতীয় চাষী, শ্রমিক ও মজুর যে পরিমাণ ক্যালরি খায় আর যা পরিশ্রম করে তার সঙ্গে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের চাষীর কায়িক শ্রমের তুলনাই করা যায়না

যারা বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদের লোকে সমীহ করে। কারণ বড় প্রতিষ্ঠান মানেই বিরাট কালচার। কিন্তু খতিয়ে তুলনা করলে দেখা যায় মালিকদের চরিত্র সর্বত্রই এক। কর্মচারীদের প্রতি তাদের ব্যবহারও কমবেশি একই রকম তা সে এক কোটি টাকার কম্পানি হোক অথবা একশ কোটি টাকার কম্পানি হোক। শুধু বেতনের ও সুযোগ সুবিধার ফারাক থাকতে পারে। আবার অনেকে বংশমর্যাদাকে খুব ওপরে স্থান দেন। কোনও বনেদি বড়লোকের পরিবারে কোনও ছেলে ভাল হলে লোকে বলে হবেনা, পরিবারের ঐতিহ্য আছেতো! কিন্তু বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু ছেলেমেয়ে বখে গেছে। তাঁদের দীনতা ও নীচতা নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। বিয়ের সম্বন্ধ করার সময় লোকে বলে বড়লোকের ঘরের মেয়ে এনোনা, দেমাক হবে। গরিবের ঘরের মেয়ে আনা তাহলে মিলে মিশে থাকবে। কিন্তু আমি দেখেছি বহু গরিবের মেয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে মোটেই মালিয়ে চলেনি। আবার বড়লোকের মেয়ে এসে গরিব ঘরে মানিয়ে নিয়েছে।

সুতরাং স্টিরিওটাইপ বা প্রচলিত ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষকে বাইরে থেকে বিচার করতে গেলে বিচারে ভুল হবে।

মানুষ চেনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সোনা রূপো বা হীরে কিংবা মনি মুক্তো চেনা বরং সোজা। কারণ রত্ন চেনার জন্য উপযুক্ত কষ্টিপাথর আছে বা বিচার করার বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। আপনার আঙুলের রুবি বা গোমেদ খাঁটি কিনা তা আপনি আলিপুর গেস্ট হাউসে পাঠিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু মানুষ চেনবার জন্য কোনও একটা যন্ত্র বা একটা কষ্টিপাথর নেই। মানুষ অভিনয় করতে পারে। মনের ভাব গোপন করতে পারে। এক একজন লোকের কাছে বা এক এক সময় এক এক রকমের ভূমিকা অভিনয় করতে পারে। আমরা যাকে জনপ্রিয় বলে জানি, সেই জনপ্রিয়তা দেখেও লোকটির প্রকৃত চরিত্র বোঝা যায় না।

কারণ জনপ্রিয়তা একধরনের আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব। চরিত্র নয়। একজন

সচেতনভাবে চেষ্টা করে জনপ্রিয় হতে পারে। অফিসের একজন বস যদি অধস্তনদের কাজ করতে না বলেন ও উচ্ছৃঙ্খলদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেন তাহলে তিনি জনপ্রিয় বস হবেন। কড়া প্রশাসক জনপ্রিয় হবেন না। দক্ষ প্রশাসকও জনপ্রিয় না হতে পারেন। বড়লোকেরা পাড়ার পুজোয় মোটা টাকার চাঁদা দেয় তাতেই তারা পাড়ায় জনপ্রিয়। সে বিভিন্ন কমিটির সভাপতি হয়। জনপ্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রেই কেনা যায়।

তাহলে কী মানুষ চেনার কোনও বৈজ্ঞানিক উপায় নেই ?

নিশ্চয়ই আছে। তবে যিনি মানুষকে বিচার করবেন, তাঁকে আগে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ হতে হবে।

॥ আট ॥
অহংকারি লোকদের চিনে নিন

যেসব মানুষ কম কথা বলেন, একটু অসামাজিক বা কম মিশুক লোকে তাদের অহংকারি বলে ভাবে। অহংকারি অর্থে অহং অর্থাৎ আমিই সব এই ধরণের ভাব। অহংকার থেকে উন্নাসিকতা এমনকি হতাশাও আসতে পারে। উন্নাসিকতা মানে চারপাশের সাধারণ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে না চলা। উন্নাসিকরা সব কিছুর মধ্যেই খুঁত দেখে। কোনও কিছুই তাদের মনঃপূত হয়না। আরে দূর, এটা কি একটা লেখা হয়েছে ! এটা কি একটা ছবি ! এটা কি একটা ড্রইং ! সবাই যাকে ধন্য ধন্য করে উন্নাসিক তাকে নস্যাৎ করে দেয়। কলকাতার উন্নাসিকরা একসময় রবীন্দ্রনাথকেও নস্যাৎ করে দিয়েছিল। এই যে আমি মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয় সহজ সরল করে সাধারণ মানুষের জন্য লিখছি উন্নাসিক পাঠক হলে তা কখনও পড়বেন না। তিনি মনস্তত্ত্বের জার্নালে ভীষণ শক্ত ও জটিল করে কোনও লেখা না হলে কখনই ভাল বলবেন না।

অহংকারি ও উন্নাসিকদের কীভাবে চিনে নিতে হবে সেটা আগে বলি। তারপর বলব কীভাবে একজন অহংকারি উন্নাসিকে পরিণত হয়। সবশেষে ব্যাখ্যা করবো একজন অহংকারিও উন্নাসিক হয় কেন ? অহংবোধ প্রতিটি মানুষেরই আছে। ইংরাজিতে একে আমরা 'ইগো' বলে থাকি। অহং বা আমি থেকেই গোটা মনস্তত্ত্বের উৎপত্তি। প্রতিটি মানুষেরই নিজের উপর বিশ্বাস থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' আমি বলি নিজের উপর বিশ্বাস হারানো অপরাধ। বিনয় ও দাস মনোভাব এক নয়। প্রতিটি মানুষের আত্মবিশ্বাসের বর্ম এত পুরু ও শক্ত হওয়া দরকার যে লোকের নিন্দা, আঘাত তাকে বিদ্ধ করতে পারবেনা। তার লক্ষ্য থেকে তাকে কেউ সরাতে পারবেনা।

কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাসকে মনের গোপনে রেখে দিতে হবে গোপন কথার মত নয়। যে তা পারেনা, তাকে বার বার প্রকাশ করে ফেলে বহুবিধ বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে, তখন তাকে বলা হয় অহংকার। সাধারণত হীনমন্যতা থেকে অহংকারবোধ আসে। মানুষ যা নয়, তাকে প্রমাণ করার জন্য অথবা তার অক্ষমতা ও দুর্বলতা চাপার জন্য দুর্বলতা প্রকাশ করে। সেই দুর্বলতাই অহংকার। অহংকারি ব্যক্তি ধরাকে সরাজ্ঞান করে। নানা রকমের হাস্যকর আস্ফালন করে। আমাদের ইস্কুলে একজন মাস্টারমশাই ছিলেন। তাঁর এক জন বড় কবি ও লেখক হবার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তাঁর তেমন নাম ডাক হয়নি। তবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা ছাপা হত। তিনি আর কাউকে শোনাবার লোক না পেয়ে ক্লাশের ছেলেদের বলতেন, আমার এই যে কলম দেখছ, এই কলম, টাকা আনে। আমি ছাড়া বাংলা কেউ বোঝেনা। তিনি ক্লাসে যত প্রতিষ্ঠিত কবির লেখা পড়াতেন তার তত বেশি ভুল ধরতেন। নিজের অসাফল্যকে চাপা দেওয়ার জন্য তিনি অহংকারি হয়ে উঠেছিলেন।

হঠাৎ বড়লোক হওয়া ব্যক্তি বিত্তের অহংকার করে। অবস্থার এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা আদিম স্পৃহা। এটাই তার অহং বা ইগোর বহিঃপ্রকাশ। হঠাৎ হঠাৎ কোনও উদ্দীপক পেলে এই ইগোর বিশ্রী রকমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়। দেখবেন, রাস্তা দিয়ে একটি ট্রাক চলছে বেশ স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু পাশ দিয়ে যেই আর একটি ট্রাক দ্রুততর গতিতে বেরিয়ে গেল, অমনি পিছিয়ে পড়া ট্রাকের ড্রাইভারের মনের 'ইগো' জেগে উঠল। সে তার গাড়ির গতি দ্রুততর করে দিল। এইভাবে দুই ট্রাকে চলল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফলেই বহু দুর্ঘটনা ঘটে। বড়লোকদের পরস্পরের মধ্যেও চলেও পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে, তখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে। গান বাজনা, নাচ, পড়াশোনা সমস্ত কিছু উদ্যোগের ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজেকে তিলে তিলে গড়া যায়। কিন্তু অহং এর অতিপ্রকাশ থেকে যেসব প্রতিযোগিতা তা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রেষারেষির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়।

আগেকার দিনে রাজামহারাজা এবং জমিদাররা এই সব অনর্থক নেতিবাচক প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছেন।

হালফিলের বিত্তবানদের পাড়াতেও দেখবেন, বাড়ি ও গাড়ির প্রতিযোগিতা চলছে। কার কটা বাড়ি, কটা গাড়ি, কে কীভাবে কত টাকা খরচ করে বাড়ি সাজাচ্ছে তার প্রতিযোগিতা চলে। আধুনিক মনোপলিস্টরা কে কত কম্পানি কিনে নিতে পারলেন, তার প্রতিযোগিতা চলে। কার কটি রেসের ঘোড়া আছে তার প্রতিযোগিতাও চলে। কনজিউমার সমাজ বা ভোগবাদী সমাজে নানা ভোগ্য পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে মানুষ আজ দিশাহারা। সে আজ ঠিক করতে

পারছেনা, কোনটা তার প্রয়োজন আর কোনটা তার বিলাসিতা। সে শুধু প্রতিবেশীর ঐশ্বর্য দেখে, আর তুলনা করে। তারপর তাকে টেক্কা দেবার জন্য সে নিজের ভোগ্যপণ্য কেনার পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়।...এইভাবে তার অবচেতন মনের অহংকার একটু একটু করে বাড়তে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ না সে তার ঐশ্বর্য ও সাফল্যের কথা লোককে জানাতে না পারছে ততক্ষণ সে অস্বস্তি অনুভব করে। এজন্য দেখবেন, বিত্তবান ব্যক্তিরা একটু সুযোগ পেলেই তাঁদের বিত্তের গল্প শোনাচ্ছেন।

১. আর বোলনা ভাই, আমার ড্রাইভারটি হঠাৎ ছুটি নিয়েছে। তাই ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করতে হচ্ছে।

২. ছুটিতো একদম পাইনা। এবার পেলাম তাই স্টেটস থেকে ঘুরে এলাম।

৩. বোম্বে ও ব্যাঙ্গালোর দুজায়গাতেই টেস্টম্যাচের টিকিট পেয়েছিলাম। বম্বেরটা আমার ছেলেকে দিয়ে দিলাম। আমি বাঙ্গালোর ঘুরে এলাম। অবশ্য আমার নিজের কাজও কিছু ছিল।

৪. আমি তিনটে ক্লাবের মেম্বার, বেশি ক্লাবের মেম্বার হয়ে কী হবে। ক্যালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব আর স্যাটারডে ক্লাব তিনটে বড় ক্লাব ধরে রেখেছি এই যথেষ্ট।

৫. আমার মেয়ে এখন ভাল নাচছে, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতিভবনে প্রতিবছরই ফাংশন করে। ডঃ শর্মা নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। এবারও দিল্লি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ওর ফাংশন আছে অক্টোবরে। আপনাকে জানাবো। কলকাতার কাগজে কি লিখল না লিখল তা এসে যায়না মশায়, দিল্লির টাইমস অব ইন্ডিয়াতে বাচ্চি কাঙ্কারিয়া ওর সম্পর্কে এক কলম আর্টিকেল লিখেছেন—ওয়ান্ডারফুল ট্যালেন্ট আই হ্যাভ এভার সিন—লিখেছেন তিনি আর কী চাই!

৬. নিউজার্সিতে একটি ছোটখাটো বাড়ি করেছি আপনাদের আশীর্বাদে। যদি কখনও যান। পায়ের ধুলো দেবেন। আমজাদখান, সুনীল গাঙ্গুলি, মৃণাল সেন, শীর্ষেন্দু আমেরিকায় গেলে আমার বাড়িতেই ওঠেন। গার্মেন্ট ইমপোর্টের একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে। বাঙালিতো অন্যকে কাঠি দিতে ওস্তাদ। কলকাতায় এসে অনেকবার জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি। হি ইজ ভেরি সিনসিয়র। উনি চান রাজ্যের কিছু উন্নতি হোক। কিন্তু ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা যা—আর বলার কিছু নেই। ফোর্থ ক্লাশ। এখনকার আই এ এসদের সঙ্গে কথা বলা যায়না। ভুলে যাবেন না, আমিও প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলাম। নকশাল মুভমেন্টে আমি এক নং অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম। খবরের কাগজে এর ওর আত্মজীবনী পড়ি আর হাসি। আমার এখনও কলকাতার ওপর টান আছে বলে আসি। একটা

কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমার ছেলেমেয়েরাতো কলকাতায় আসতেই চায়না।

৭. আমরা কারও দয়ায় ক্ষমতায় আসিনি। জনগণ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে, আরও দীর্ঘদিন রাখবে। তারা আমাদের চায়। নয়তো সব জায়গায় ক্ষমতা বদল হয়েছে এই ষোল বছরে। আমাদের রাজ্যে কেন হয়নি ? এটা বুঝতে হবে। তার কারণ, আমরা জনগণকে যা দিয়েছি তা আর কেউ দিতে পারেনি। আমাদের দক্ষতার কোনও নজির নেই। একথা কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আছি, থাকব। আমাদের বিরোধিতা করছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক। তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। কিন্তু শৃঙ্খলার বিনিময়ে আমরা অন্য কিছু হতে দেব না। যেখানে দরকার হবে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের পুলিশ দমন করবে।

ওপরের উদাহরণগুলি অহংকারের ভাষাগত প্রকাশ। কিন্তু কিছু না বলে আচরণের দ্বারাও অহংকার প্রকাশ করা যায়।

বিত্তবানের স্ত্রীরা সবাই গহনায় মুড়ে যখন সামাজিক অনুষ্ঠানে আসেন তখন সেটাও অহংকার। অথবা তিনি যখন পারিবারিক সম্মেলনে শুধু বড়লোকদের খাতির করেন ও গরিব আত্মীয়দের উপেক্ষা করেন সেটিও অহংকার।

অহংকার থেকে অন্যদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার ভাব আসে। আমি মন্ত্রীদের মধ্যে দেখেছি ক্ষমতায় বসলে তাঁরা নিরক্ষর গরিব জনসাধারণের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা পর্যন্ত বলতে ভুলে যান। তাঁদের তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ে কড়া মেজাজের মধ্যে। আবার যখন তাঁদের ক্ষমতা চলে যায় তখন তাঁরা একেবারে সাধারণ মানুষ হয়ে যান।

অহংকার যেখানে আত্মবিশ্বাস, সেখানে অহংকার জীবনে টনিকের মত কাজ করে। নিজের ওপর আস্থা না থাকলে প্রতিকূল কোন অবস্থার বিরুদ্ধেই লড়াই করা যায়না। তা নাহলে পরনির্ভরতা ক্রমশ পেয়ে বসে। একজন সুস্থ মানুষ যদি একমাস বিছানায় শুয়ে থাকে, তাহলে দেখবেন একমাস পরে তার চলতে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি দুর্বলতা বোধ করছেন। বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিও প্রথম প্রথম তাদের কাজে নার্ভাসবোধ করতেন। তারপর ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে তবে সেই কাজে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। আবার অনেক কর্মী মানুষকে দেখেছি তাঁরা একটি বিরাট কাজের দায়িত্ব যখন নিচ্ছেন তখন কোনও টাকা পয়সা বা আর্থিক সহায় সম্বল নেই। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের জোরে তাঁরা সেই কাজগুলি শেষ করেন। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ রক যিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেই একনাথ রাণাডের সঙ্গে আমার একবার কলকাতায় দেখা হয়। তখন বিবেকানন্দ রক শুধুমাত্র একটি

আইডিয়া ছিল। বিশাল প্রজেক্ট। তাঁর কোনও সহায় সম্বল ছিলনা। শুধু আত্মবিশ্বাস আর প্রচণ্ড সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া। আমাকে তিনি বলেছিলেন, আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্য সত্য তিনি তা করেছিলেন। খুব বড় করে স্বপ্ন দেখতে না পারলে খুব বড় কিছু করাও যায়না। শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবেনা। তাকে রূপায়িত করতে হবে। তার জন্য লেগে থাকতে হবে। মনে মনে বলতে হবে আমি পারব, কিন্তু সক্রিয়ভাবে কাজ না করে মুখে যদি কেউ বলে, আমি এটা সহজেই করতে পারি তাহলে সেটি অহংকার। অথবা কোন কাজ করার পর যদি কেউ সাফল্য নিয়ে ক্রমাগত বড়াই করতে থাকেন তাহলে সেটাও অহংকার। তবে কেউ যদি বলেন, আমি এইভাবে করে ফল পেয়েছি, আপনিও চেষ্টা করুন, তাহলে সেটি আর অহংকারের পর্যায়ে থাকেনা। এজন্য আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মজীবনীকে এত গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি একটি মানুষকে কত অসুবিধার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিকূলতার সঙ্গে। কতবার ব্যর্থ হতে হয়েছে। শুধু আত্মবিশ্বাসই জীবন যুদ্ধে জয়লাভের বড় কথা।

এই আত্মবিশ্বাসের চিড় ধরতে পারে নানা কারণে। তার মধ্যে একটি কারণ হল ছেলেবেলা থেকে আত্মনির্ভরশীল না হয়ে পরাশ্রয়ী হয়ে বড় হয়ে ওঠা। বাবামায়ের আদুরে ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভরতা গড়ে ওঠার সুযোগ হয়ে ওঠেনা। দ্বিতীয়ত সাধারণ মানুষ অন্যের আয়নায় নিজের ব্যক্তিত্বের মুখ দেখে থাকে। পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সহকর্মী আত্মীয় স্বজন, হঠাৎ আলাপ হওয়া মানুষ জন, প্রেমিক প্রেমিকার চোখে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে। একেবলে 'মিরর ইমেজ'। এখন যদি সংসারে সবাই আপনাকে দূর ছাই করে তাহলে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে পারেনা। আপনার অহংবোধ আহত হয়। এতে চরম হতাশা আসে। অনেক সময় বহুলোক সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে সংসার ত্যাগ করে। সেটা এই কারণে যে তার ছেলে মেয়ে বউ বা স্বামী সবাই তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছে। মানুষ সব সহ্য করতে পারে, সে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, অর্দ্ধাহারে থাকতে পারে। কিন্তু অবহেলা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, বিদ্রুপ অপমান বেশি সহ্য করতে পারেনা। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, শিশুদের এই মিররইমেজ খুব দরকারি। কারণ আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়। অর্থাৎ লোকে যে ছেলেটিকে বলবে ঃ 'বাঃ, খুব ভাল ছেলে—সেই ছেলেটিই ভাল। ছেলেবেলায় বাবা মাও ছেলেমেয়েদের 'গুড বয়', 'গুড গার্ল' সার্টিফিকেট পাবার মত করে তৈরি করেন।

এই প্রেষণা (motivation) ছেলেমেয়েদের খুব উৎসাহ যোগায় কিন্তু যখন বড় হয়ে আরও বৃহত্তর জগতে ঢুকে সে দেখে এতদিন সে তার নিজের সম্পর্কে যা ভেবে এসেছিল, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, বৃহত্তর জগতের

প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মত তার শক্তি নেই, তখন তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে।

তাই ছেলেবেলা থেকে বাস্তববাদী করে তুলতে হবে ছেলেমেয়েদের। কখনও তাদের অকারণে তোল্লাই দিতে নেই, তারা যা নয়, তা বাড়িয়ে বলতে নেই। অনেক বাবা মা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছেলেমেয়েদের ভাবমূর্তি তৈরি করেন। এটি খুবই খারাপ। তাদের নিরুৎসাহ করা উচিত নয়, আত্মবিশ্বাসে ঘা দেওয়া উচিত নয়, আবার যা নয়, তাই বলা উচিত নয়। তাদের বলা উচিত, 'দেখো, যখন তুমি আরও বড় জায়গায় যাবে তখন আরও অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। তাদের মধ্যে অনেক ভাল ভাল ছেলেমেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে পেরে উঠতে গেলে তোমাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। মনে জোর বাড়াতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে প্রতিযোগিতায় সবাইতো প্রথম হতে পারেনা। যারা প্রথম হতে পারল না, তারা যে খারাপ দৌড়েছিল তা নয়। নানাকারণে তারা প্রথম হতে পারেনি। তারা আবার অন্যান্য আইটেমে হয়তো ভাল ফল করেছে। ভেঙে পড়লে চলবে না। হারজিতের কথা একদম মনে রাখবে না। তুমি কতখানি খেটেছ, সেটাই শুধু খেয়াল রাখবে। তোমার বিচার করবে তুমি নিজে। সেটাই মনে রাখবে আসল বিচার।'

কর্মজীবনে নানা প্রতিবন্ধকতার চাপে পড়ে। নানা রাজনীতির টানা পোড়েনে সবার ইমেজ ভীষণভাবে ঘা খায়। ভাল কাজ করুন, ঘুষ না নিয়ে সৎজীবন যাপন করুন, দেখবেন সহকর্মীরা আপনার শত্রু হয়ে উঠছে, পরিশ্রম করে একটা বাড়ি করুন, বন্ধুরা আড়ালে বলাবলি করছে বহু টাকা চুরি করে বাড়ি হাঁকিয়েছে, ছেলেমেয়েদের ভাল ইস্কুলে ভর্তি করুন, তারা বলবে, অমুক মন্ত্রীকে ধরে ঢুকিয়েছে। আপনার একটা প্রমোশান হলে সহকর্মীরা বসের কাছে আপনার নামে লাগাতে শুরু করবে। আপনি নিজের মনে স্বাধীনভাবে চললে বলবে আনুগত্যহীন, আপনি বসের বশম্বদ্ হলে বলবে আপনার যা কিছু উন্নতি সব তৈল মর্দন করে। আপনি মেজাজ গরম করলে বলবে, উদ্ধত, মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলে বলবে মিনমিনে ব্যক্তিত্বহীন। তাহলে আপনার 'মিরর ইমেজ' আপনার কাছে দুঃসহ হয়েছে তখন। আপনার ভাবমূর্তি গঠনের ভার যদি পরিচিত জনের উপর বর্তায় তাহলে তখনতো সে দর্পণে আপনার বিকৃত ছবি উঠছে ক্রমাগত। দর্পণে দেখা দিয়েছে বিরাট ফাটল। একমাত্র প্রবল আত্মবিশ্বাসই তখন আপনাকে রক্ষা করতে পারে।

॥ নয় ॥

মানুষ চেনার আগে নিজেকে চিনুন

অধিকাংশ লোক গর্ব করেন, আমি মশাই লোক চিনি। আমাকে অনেকে বলেন, তুমি একদম বোকা, লোক চিনতে পারোনা। যাকে তাকে বিশ্বাস করো এইজন্য তোমাকে সবাই ঠকায়। কেউ বলেন, পার্থবাবু, আপনি বড় ভালমানুষ। এজন্য লোকে আপনাকে পেয়ে বসে। আমাকে সবাই ঠকায় একথা ঠিক। কেউ যদি দশ টাকার জিনিসটা ছটাকায় কেনে আমি সেটা নির্ঘাৎ বারো টাকায় কিনব। বাজারে গেলে দোকানীরা পচা ফল আনাজপত্র এবং ছেঁড়া ফাটা নোট বেছে বেছে আমাকে গছাবে। ওজনে আমি কেজিতে একশ গ্রাম কম পাবোই। অগ্রিম টাকা নিয়ে মিস্ত্রি আর আসবেনা। আমি কারও কাছে টাকা পেলে সে টাকা আদায় করতে জুতোর সুখতলা খয়ে যাবে, অবশেষে আমি টাকাটার আশা ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকটা যে আমাকে ঠকাতে পারে আমি ভাবি, আবার এও ভাবি হয়ত নাও পারে। বিশেষ করে যখন একজন কেউ দিব্যি গেলে বলছে। টাকাটা দিন, আপনার কাজটা আমি করে দেবই। তখন আমি তার চোখমুখের চাহনি দেখে, তার কথা বলার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আমার সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার দেখে ভাবতেই পারিনা, এসবই লোকগুলির মুখোশ। অথবা ভাবলেও ভাবি ঠিক আছে ঠকাক। আমরতো লোক চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হবে। তা হয়েছে। বহু মূল্যবান সেসব অভিজ্ঞতা। আমি সারা জীবন ধরে শুধু ভদ্রবেশী খারাপ লোকই বেশি দেখেছি। মানুষ যে সামান্যকারণে অথবা বিনাকারণে শুধু আত্মরতি তৃপ্ত করার জন্য কত নিষ্ঠুর হতে পারে, কত শঠ, প্রবঞ্চক, চতুর ও ইতর হতে পারে সে সম্পর্কে আমার চেয়ে কারও বেশি অভিজ্ঞতা নেই। আমার পুত্রসম ব্যক্তিরাও সাবালক হয়ে আমার অতিকরার ক্ষতিকরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা বলে সব মানুষ খারাপ নয়। আমি বহু ভাল মানুষ দেখেছি। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। আমি মানুষকে যদি অবিশ্বাস করি তাহলে আর মানুষের নিত্য লীলা খেলা দেখতে পাবোনা। নিত্য নতুন মানুষ চিনতেও পারব না।

যে লোকটি আমার কাছে শঠ ও প্রবঞ্চক সে হয়তো তার বন্ধুদের কাছে খুবই সরল ও সদালাপী। তার ছেলেমেয়েদের কাছে পবিত্র চরিত্রের মানুষ। তার এই দুইরূপই সত্যি। সুতরাং বস্তুনিষ্ঠ না হলে, নিরপেক্ষ না হলে তার এই দুইরূপ দেখা যাবে না, নির্মোহ হতে গেলে প্রত্যেককে আগে নিজেকে জানতে হবে। শাস্ত্রে যাকে বলেছে আত্মানং বৃদ্ধি।

আমাদের প্রত্যেকেরই ধারণা

১. আমি নিখুঁত। আমার দোষত্রুটি একদম নেই।

২. আমার চেহারাটি খুব খারাপ নয়।

৩. অন্যে যেসব সাফল্য অর্জন করেছে তার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বিশেষ কারণ আছে। যেমন কারও মামার জোর আছে। কেউ বা সরাসরি পার্টি করে। কারও বাবা দাদা কাকা পিসে মেসো প্রভাবশালী জায়গায় রয়েছে এবং সময়সুযোগ মত আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে ছড়ি ঘোরাচ্ছে, কারও বাবার প্রচুর টাকা, কারও জন্মদত্ত প্রতিভা, কেউ শুধু সব ছেড়ে দিয়ে বই পড়েছে, তার ফলেই তার উন্নতি। অথবা তেল দেওয়ার জন্যই উন্নতি।

হ্যাঁ স্বীকার করছি, তৈল দান করেও কারও কারও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। কিন্তু আপনি কি তৈলদান করতে পারবেন ? পারবেন না, কারণ সেটাও এক সূক্ষ্ম নৈপুণ্য। আপনি যাকে খোশামোদ বলছেন, আমি যদি তাকে বলি সুসম্পর্ক, মেশবার ক্ষমতা। তার উত্তরে আপনার কি কিছু বলার আছে ?

বহু লোককে ঘুষ দিন, তিনি ঘুষখেতেও পারবেন না। কারণ ঘুষ খেতেও বুকের পাটা লাগে, ডাকাতি করতে বা মস্তানি করতেও সাহস লাগে। চোরেদের বুদ্ধি পুলিশের থেকেও বেশি। যারা ভীরু, অসমর্থ, নিজেরা কিছু করতে পারেনা, তারা অন্যের মধ্যে বিপরীত গুণ দেখলে তার নেতিবাচক দিকটা বড় করে দেখে। কিন্তু নেতিবাচক দিকটি বন্ধ করে তার বিপরীত দিকটি প্রকাশ করলে একজন ডাকাত বিরাট সমাজসেবীতে পরিণত হতে পারে। কারণ ডাকাতের সাহস, ভয়শূন্যতা, কর্মক্ষমতা সমাজসেবার জন্যও দরকার হয়। তাই অন্যকে জানার আগে নিজেকে জানা দরকার। তাহলেই বুঝতে পারবেন, যে সফল হয়েছেন সে কেন সফল হয়েছে। যে ব্যর্থ সে কেন ব্যর্থ। আরও বুঝতে পারবেন যে লোকটি আপনার কাছে বড়বড় কথা বলছে সত্যিই লোকটির এলেম আছে কিনা। নিজেকে জানা দরকার এই কারণে যে আপনার ধ্যান ধারণা একপেশে কিনা তা যাচাই করে নিন। নিজেকে প্রকৃত জানার পথে বাধা অনেক। বাধাগুলি একে একে বিশ্লেষণ করা যাক।

১. যারা ছেলেবেলা থেকে বাবা মা দাদা দিদি আত্মীয় স্বজনের আদরে মানুষ হয়, বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, বাবা মা আত্মীয়রা মুখের কথা খসাতে না খসাতে তার হাতে জিনিষপত্র তুলে দেয় সে এই ধারণা নিয়ে বড় হয়ে ওঠে যে সবাই তাকে কিছু না কিছু দেবে। ছেলেবেলা থেকে সে প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত, হুকুম করতে অভ্যস্ত। বড় হলেও সে হুকুম করতে শেখে। সে একটুতেই চটে যায়, অন্যের ত্রুটি তার কাছে ভীষণভাবে ধরা পড়ে, কারও পাণ থেকে চুন খসলে আর তার রক্ষা থাকে না। সে শ্রেষ্ঠম্মন্যতায় (Superiority Complex) ভোগে। তাই তার পক্ষে অন্যকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। সে নিজেও তার সম্পর্কে পক্ষপাত দুষ্টবিচার আশা করে। সাম্প্রতিককালে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের

তরুণ সমাজের মধ্যে এই ধরণের ব্যক্তিত্বই বেশি। কারণ তারা অনেকেই ছোট পরিবারের একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকে আদরে আদরে বড় হয়েছে।

২. অনরূপভাবে কারও মনে হীনম্মন্যতা জাগাতে পারে। যদি ছেলেবেলায় কেউ মা বাবার ভালবাসা না পায়, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য পায়, বন্ধুবান্ধবরা যদি কাউকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে তাহলে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনা। তার মনে হয় সত্যিই মুই অতি ছার। খুব গরিবের ঘরের ছেলেমেয়ে, অনাথ শিশু, লাঞ্ছিত নিপীড়িত শ্রমিক বড় হলেও তার মধ্যে হীনম্মন্যতা যায়না। নিরক্ষর গরিব মানুষদের শিক্ষিত ও ধনীদের সামনে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়না। কর্মক্ষেত্রে দেখা গেছে কেউ যদি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়, যোগ্য প্রমোশান, পদমর্যাদা ও দায়িত্ব না পায় তাহলে তার নিজের সম্পর্কে ধারণা খুবই খারাপ হয়। একদিন সে নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সে অকর্মণ্য।

৩. জাতপাত বর্ণও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। আত্মোপলব্ধি ঘটতে নানা বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। আমি দেখছি হিন্দুমুসলমানের বহু ছেলেমেয়ে ছেলেবেলা থেকে বাবা মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাবের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। দরিদ্রের ছেলেমেয়েরাও বড়লোকদের ঘৃণা করে সেই ঘৃণার পরিবেশের মধ্য দিয়ে তারা বড় হয়। তফশিলি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা অনেকেই উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে ঘৃণা নিয়ে বড় হয়। যত উচ্চ শিক্ষা পাক না কেন, এই ঘৃণা যায়না। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব বেশি। আর্থিক অবস্থা তাঁদের স্বচ্ছল। অথচ তাঁরা ঘৃণা করেন সমতলের ভারতীয়দের। কেননা, এই ঘৃণা তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। শৈশব পরিবেশে এই ঘৃণার মধ্যে দিয়ে লালিত হয়েছেন। সুতরাং উত্তরজীবনে তাঁরা কিছুতেই সমতলবাসী সম্পর্কে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ হতে পারবেন না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। আমি স্বাভাবিক প্রবণতার কথা বলছি। এলিজাবেথ হারলক বলছেন ঃ

'যদি কোনও শিশু সমাজে গৃহীত হয়, অনুমোদিত হয়, সম্মানিত হয় এবং তাকে সবাই পছন্দ করে তাহলে সে তখন নিজেকে গ্রহণ করবে—কিন্তু যদি দেখা যায় তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা, তার বাবা মায়েরা, তার শিক্ষকেরা তার বন্ধুবান্ধবেরা, তাকে ছোট করছে, প্রত্যাখ্যান করছে তাহলে শিশুর নিজের সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। অন্যরা তাকে যে চোখে দেখে, ধীরে ধীরে সেও নিজেকে

সেভাবে দেখতে শিখবে।" ("পার্সোনালিটি ডেভলপমেন্ট, এলিজাবেথ হার্লক।)

নিজের সম্পর্কে সঠিক নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ নিজেকে চেনার জন্য আগে গড়ে ওঠা দরকার। ছেলেবেলা থেকে যাতে শিশুর মনে কোনও Complex গড়ে না ওঠে সেটি দেখার দায়িত্ব বাবা মায়ের। বিশেষ করে মায়ের শৈশবে মায়ের ভালবাসা অন্যের ভালবাসার অভাব পূরণ করে দিতে পারে।

কিন্তু মা বাবারই উচিত ছেলেমেয়েদের মনে এমন একটি আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শ ধরিয়ে দেওয়া যেটি বাস্তব সম্মত এবং সাধ্যায়ত্ত। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের শক্তিমত্তা বিবেচনা না করেই তাদের সামনে রঙীন স্বপ্নোজ্বল ভাবমূর্তি হাজির করা হয়। মধ্যবিত্ত সব বাবা মা ভাবেন তার ছেলেমেয়ে সবচেয়ে বড় স্কুলে পড়বে, জয়েন্ট এনট্রান্স পাশ করে ইঞ্জিনিয়ার হবে কিংবা ডাক্তার হবে।একটু সুশ্রী মেয়েদের সামনে ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয় তারা ডানাকাটা পরী। বিরাট ইঞ্জিনিয়র, মিত্র কভেনেনটেড (কথাটির মানে তাঁরা অনেকেই জানেন না) অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হবে। আঠারো কুড়ি একুশ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা সবাই নিজেদের

তরুণীর স্বপ্ন ঃ বিয়ের আগে ও বাস্তবে

সিনেমার হিরোর মত সুন্দর বলে মনে করে। যাদের ছেলে মেয়ের গানের গলা আছে, তাদের বাবা মায়েরা মনে করেন ছেলেমেয়েরা এখনই বেতার দূরদর্শনে স্থান পাবার যোগ্য। এই ধারণা ছেলেমেয়েদের মধ্যেও করিয়ে দেওয়া হয়। একথা ঠিক প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেটি কোনদিকে তা তারা বুঝতে পারে না। বাবা মায়েরা যদি ধারণা করিয়ে দেন, তুমি বিরাট গায়ক, বিরাট শিল্পী, বিরাট অভিনেতা, তাহলে বাস্তব জীবনে তার মূল্য না পেলে সে হতাশ হয়ে পড়ে। যে নিজেকেই চিনতে পারেনি, নিজের এলেম কতখানি তা

উপলব্ধি করেনি, সে অন্যকে বিচার করবে কি করে ? আবার অন্যদিকে এমন অনেক সুপ্ত প্রতিভা আছে সে নিজেই জানেনা। কত লোককে দেখেছি কি সুন্দর ইংরাজি বাংলা লেখে। চেষ্টা করলে সে বড় লেখক সাংবাদিক হতে পারত। কিন্তু কেউ তাকে উৎসাহ দেয়নি। কেউ তাকে বলে দেয়নি। তার ফলে নিজেকেই সে চিনতে পারেনি। রামকৃষ্ণ না থাকলে বিবেকানন্দ কি নিজেকে চিনতে পারতেন ? তিনি সেই অর্থে ছিলেন আপন ভোলা যুবক। যে কোনও একটি কেরানীর চাকরি পেলেই তিনি খুশি হতেন। আবার অরবিন্দকে কোনও গুরুজী হাত ধরে পণ্ডিচেরী নিয়ে যাননি। তিনি আলিপুরে নির্জন জেলে বসে নিজেকে আবিষ্কার করেছিলেন।

তাই বলি মানুষ চেনার আগে নিজেকে চিনুন।

॥ দশ ॥
চেকলিস্ট মিলিয়ে নিন।

আমি যেসব হাসিখুশি সদালাপী লোকদের জানতাম তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগকেই দেখেছি দায়িত্বশীল পদে যাওয়ার পর গম্ভীর স্বল্পবাক হয়ে যেতে। তাঁরা সব সময় অন্যমনস্ক, সন্দেহপ্রবণ এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মুখে চোখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

খুব উঁচুপদে গিয়ে বিরাট দায়িত্ব পেয়েও তাঁরা ভীরু কাপুরুষের মত আচরণ করেন। মন্ত্রী ও সমতুল ক্ষমতাবানদের পায়ে লুটিয়ে পড়েন।

এঁদের আচার আচরণেই বোঝা যায় যে এঁদের মনে আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রবল। এঁরা সবসময়ই পথ হারাবার ভয়ে সেঁটিয়ে থাকেন। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ ঘটনাচক্রে বড় বড় পদে আসতে পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁরা যোগ্যতার জোরেই এইসব পদে এসেছেন। তবে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ ও একজন আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ দুজনকেই আলাদা করে বোঝা যায়।

প্রথম কথা ক্ষমতায় এলেও আত্মবিশ্বাসী মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহারের কখনও তারতম্য হবেনা। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে স্ট্রেস কম হবে। তিনি বিভিন্ন সংঘাতে বিচলিত হলেও তাঁর মুখে চোখে তা ফুটে উঠবে না। যাঁর আত্মবিশ্বাস নেই, তাঁকে লোকে টুপি পরাবে। লোকে নানা ভুল বোঝাবে। তিনি লোকের কথায় নাচবেন। পঞ্চতন্ত্রের সেই গল্পটা সবার জানা। তবু একবার মনে করিয়ে দেই। এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগল ছানা নিয়ে যাচ্ছিল। কয়েকটি দুষ্ট লোক ঠিক করল ছাগলটা তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেবে।

তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম জন ব্রাহ্মণকে বলল, কীগো ঠাকুর, কুকুরের বাচ্চা কোলে করে কোথায় চললেন ?

ব্রাহ্মণ বলল, এটি কুকুর কোথায় ? এটিতো ছাগল ছানা।

লোকটি হেসেই খুন। আপনার কী ভীমরতি হয়েছে ঠাকুর। কুকুরকে ছাগল বলছেন ?

কিছুদূর গিয়ে আর একটি লোকও বলল, ওটি কুকুর। এইভাবে চার পাঁচটি সাজানো লোক ছাগলছানাকে কুকুর বলতেই ব্রাহ্মণের প্রথম খটকা লাগল। এতগুলো লোক যখন বলছে তখন হয়তো কোথাও ভুল হয়ে গেছে। এটি কুকুরই। এই বলে ব্রাহ্মণ ছাগলছানাটি কোল থেকে নামিয়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তখন ধূর্ত লোকগুলো হাসতে হাসতে ছাগলের বাচ্চাটি নিয়ে চলে গেল।

আর একটি গল্প বলি। এটি ঈশপের গল্প। বাপ একটি গাধায় চড়ে বাজারে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছেলে হেঁটে যাচ্ছিল। লোকে তাই দেখে ঠাট্টা করতে লাগল। দেখ বুড়ো হয়ে মরতে চলল। নিজে গাধায় উঠে বাচ্চাটাকে হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শুনে বাবা গাধা থেকে নেমে ছেলেকে বসিয়ে চলল। আবার একদল বলল, দ্যাখো বুড়ো বাবাকে হাঁটিয়ে ছেলে কেমন গাধায় চড়ে যাচ্ছে।

বাবা ও ছেলে দুজনে মিলে তখন গাধার পিঠে চড়ল। তখন একদল লোক বলল ঃ দেখছ দুজনে মিলে ওইটুকু গাধার পিঠে উঠেছে। ওরা কী নির্দয়।

সর্বশেষে বাবা ও ছেলে গাধাটাকেই পায়ে দড়ি বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে কিছু লোক হাততালি দিতে লাগলে। একটি সেতুর উপর দিয়ে যাবার সময় গাধাটা ভয় পেয়ে দড়ি ছিঁড়ে নিচের নদীতে লাফিয়ে পড়ল আর মারা গেল।

ওপরের গল্প দুটিই আত্মবিশ্বাসের অভাবের গল্প। আত্মবিশ্বাস না থাকলে তখন লোকের কথায় ছাগল ছানাকে কুকুর বলে খটকা লাগে। সবাইকে সন্তুষ্ট করার দরকার পড়ে তখনই যখন কেউ মনে করে আমি ঠিক পথে যাচ্ছিনা।

আত্মবিশ্বাসের অভাবে লোকে নিজের কর্মক্ষমতার চেয়ে আংটি, পাথর তাবিজকবচ ঝাড় ফুঁককে বেশি করে বিশ্বাস করে। আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটলেই লোকে অন্যের দ্বারা চালিত হয় এবং এসবক্ষেত্রে প্রায়শই ধান্দাবাজদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্যই। সুতরাং আচরণের দ্বারাই চেনা যায় কার মধ্যে আত্মবিশ্বাস কতখানি।

আত্মবিশ্বাস বস্তুটি কী ? অভিধানের অর্থ নিজের ওপর বিশ্বাস। তার মানেকী আমি যে পথে চলছি ঠিক পথে চলছি এই ধরনের মনোভাব ? আমিই ঠিক আর সবাই ভুল, এই মনোভাবও ভুল। পৃথিবীতে কোনও মানুষই অভ্রান্ত নয়। মুনিরও মতিভ্রম হয়। আত্মবিশ্বাসী মানুষকেও মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিতে হয়। ইতিহাসে অনেক বুদ্ধিমান জ্ঞানী গুণী রাজার কথা আছে। কিন্তু তাঁদের সকলেরই মন্ত্রী ছিল। সুতরাং আত্মবিশ্বাস খুব বড় জিনিস কিন্তু আত্মবিশ্বাস থাকা মানে এই নয় যে আর কারও সঙ্গে চেক করব না। কিন্তু কোথায় পরামর্শ নিতে

হবে কোথায় নিঃসন্দেহে চুপ করে থাকতে হবে সেটি নির্ভর করবে ওই আত্মবিশ্বাসের রকমফেরের উপর। যে নতুন লেখালেখি করছে সে লেখা নিয়ে পাঁচজনকে পড়াবে। বলবে, দেখুনতো লেখাটা হয়েছে কিনা। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যাঁর আছে, পাকা বা ঘাগুলোক যিনি, তিনি লিখেই বুঝতে পারবেন, লেখাটি ভাল লিখেছেন না খারাপ লিখেছেন। আত্মবিশ্বাস জন্মায় বহু ঘটনা থেকে। আত্মবিশ্বাস তিলে তিলে সঞ্চয় হয়। ঝট করে আসেনা। আত্মবিশ্বাস হল নিজের ওজন বা এলেম বুঝে সেই মত কাজ করা। আত্মবিশ্বাস মানে হঠকারিতা নয়, বা দুঃসাহস নয়। ধরুন, আপনি একা যাচ্ছেন, পাঁচজন গুণ্ডা আপনাকে ধরল। তাদের সঙ্গে একা লড়াই করাটা আত্মবিশ্বাস নয়। কিন্তু ওই অবস্থায় না ঘাবড়ে গিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার পাওয়াই হল আত্মবিশ্বাস।

সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসের অনেকগুলি সংজ্ঞা দেওয়া যায় ঃ **আত্মবিশ্বাস হল অপরের সাহায্য ছাড়াই নিজের শক্তিতে লড়াই চালাবার মত মানসিকতা। আত্মবিশ্বাস হল নিজেকে কারও থেকে ছোট না ভাবা। আত্মবিশ্বাস হল অহংকারির ঘৃণার ফাঁদে পা না দেওয়া। উদ্ধত আর অহংকারিরা চারপাশে ওৎ পেতে আছে। তারা আর সবাইকে নস্যাৎ করে দিতে চায়।** আত্মবিশ্বাসী আপন বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলা চলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলে গালাগাল দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্বাসটা কেউ দেখে না। আত্মবিশ্বাস অনেকটা টাকা পয়সার মত। অর্থ উপার্জনের জন্য কোন বয়স লাগেনা, বহুলোক যৌবনে কিছুই করতে পারেননি, বৃদ্ধবয়সে অর্থ সঞ্চয় করে বড়লোক হয়েছেন। টাকা রোজগারের সঙ্গে বিদ্যার তেমন সম্পর্ক নেই। কত উচ্চশিক্ষিত লোক কোনওরকমে দিন গুজরান করছে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের জোরে একজন নন ম্যাট্রিক কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলায়, কৈশোরে বা যৌবনে অনেকের আত্মবিশ্বাস থাকেনা, কিন্তু বেশি বয়সে তাঁরা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন। গান্ধীজী এমন লাজুক ছিলেন যে তিনি ভারতে ওকালতিতে সফল হতে পারেননি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে উকিল হিসাবে নাম করেছিলেন। দেশের মধ্যে অনেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়না কিন্তু বিদেশে গিয়ে হয়। যে সমস্ত অনাবাসী শ্রমিকরা বিদেশে চাকরি করেন তাঁরা যখন বাড়ি ফেরেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন। আত্মবিশ্বাসে তারা কতখানি ভরপুর। অথচ যখন তারা এদেশে বাস করতেন সে সময় তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। আমি কিছুকাল বিদেশে কাটিয়েছি। যাঁরা প্রথম বিদেশে বসবাসের উদ্দেশে যাচ্ছে তারা আমার কাছে আসে পরামর্শের জন্য। তখন দেখি তাঁদের মধ্যে নার্ভাসনেস, কতখানি দোনামোনাভাব। কিন্তু বছরখানেক পরে যখন ছুটিতে ফেরেন তাঁরা তখন তাঁদের আর চেনাই যায়না। পোশাকে চেহারায় চাকচিক্য। চোখমুখ দিয়ে কথা বলছেন। উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটছেন তাঁরা।

আজকের মানুষের অধিকাংশ সমস্যার উৎপত্তি আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে।

পরীক্ষার হলে গিয়ে বহু ছেলেমেয়ে নার্ভাস হয়ে যায়। পরীক্ষার আগে তাদের মনে হয় সব ভুলে যাচ্ছি। কিছুই মাথায় আসছে না। তারপর পরীক্ষার হলে ঢুকে প্রশ্ন হাতে পেয়ে লিখতে শুরু করলে ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যায়। এজন্য যেটি সহজসাধ্য সেই প্রশ্নটি আগে লেখার নিয়ম। প্রথমটাতে সফল হলে তখন আত্মবিশ্বাস এসে যায়। তার জোরে সে তখন এগিয়ে যায়। এইজন্য বলে সাফল্যের মত সফল কেউ হয়না। কথাটার মানে হল প্রথম কাজেই যদি সাফল্য আসে তাহলে তার জোরে পরের কাজগুলোও সফল হয়। এইভাবে আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বাড়তে থাকে। যে এক চান্সে পাশ করছে আর যে দুতিনবার ফেল করে দুজনের আত্মবিশ্বাস সমান হতে পারে না। ধরুন দুজন গায়ক। দুজনেই ভাল গান করেন। একজনের গান হিট করে গেল। তার রেকর্ড খুব বিক্রি হল। কিন্তু আর একজনের গান হিট করল না। কিছুকাল পরে দেখবেন দ্বিতীয় জনের গানের কোয়ালিটি খারাপ হতে শুরু করেছে। প্রথম জন যিনি সাফল্যের মুখ দেখেছেন তাঁর গাণের গুণগত উন্নতি ঘটছে। অনেকে বলেন, ক্রমাগত অভ্যাস করার ফলে গুণগত উৎকর্ষ বাড়ে। কিন্তু সবসময় তা সত্য নয়। যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হতে ক্রমাগত দেরী হয়ে যায় সেই সাধনায় সাধকের সাধনা চালিয়ে যাবার মত ধৈর্য কমতে থাকে। একমাত্র উচ্চমার্গের সাধক ছাড়া, অনেকেই মাঝপথে সাধনার পথ বা পদ্ধতির পরিবর্তন করেন।

প্রথম যৌবনে অনেকে অভিনয়, গান ছবি আঁকা নাচ ইত্যাদির চর্চা করতেন। কত তরুণ লেখক লেখালেখি শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীকালে যারা নাম করতে পারে তারাই পেশাদার হয়ে টিঁকে থাকে। শৌখিন শিল্পী লেখক হয়েও অজস্র মানুষ জীবন কাটিয়ে দেন। কিন্তু তাঁরা অন্যদিকে কৃতী। ধরুন, একজন ভাল ছবি আঁকতেন। পরবর্তীকালে তিনি একটি কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে গেলেন। এর ফলে ছবি আঁকায় ভাটা পড়ল। কিন্তু অন্যদিকে মোটা বেতন, ফ্ল্যাট, গাড়ি, প্রতিপত্তি সব মিলিয়ে তাঁর যে মানসিক অবস্থা তাতে করে তাঁর আত্মবিশ্বাসে কিন্তু ভাঁটা পড়েনা। মাঝে মাঝে শুধু একটা অতৃপ্তি জাগে, এই মাত্র। ধরুন মায়াবতী সেনগুপ্তার কথা। এককালে কত্থক নাচে তিনি খুব নাম করেছিলেন। কিন্তু তারপর বিয়ে হয়ে গেল। তিনি নিজে ইংরাজি সাহিত্যের এম এ। চাকরির অফার পেয়েছিলেন এক বিজ্ঞাপন কম্পানিতে। আজ তিনি মিডিয়া ম্যানেজার, তাঁর স্বামীর নিজস্ব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম। দুই ছেলে। একজন খড়গপুর আই আই টিতে থেকে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হয়ে স্টেটসে আছে। পরের ছেলেটি চার্টার্ড ইন্টার দিয়ে বাবার ফার্মেই বসে। সল্টলেকের বিখ্যাত আর্কিটেক্ট, তাদের নতুন বাড়ি করেছেন মায়াবতী। মায়াবতীর রুফ গার্ডেনে রকিং চেয়ারে বসে দক্ষিণের ফুরফুরে হাওয়ায় মায়াবতীর সারা শরীর থেকে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ে।

তিনি এখন নাচের কথা ভাবেন না। ভাবেন কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির

কাছ থেকে আগামী বিজ্ঞাপন বাজেটের বেশ একটা মোটা অংশ ছিনিয়ে নেবেন।

অন্যদিকে সন্দীপন সান্যাল দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে গল্প উপন্যাস নাটক লিখে আসছেন। এ পর্যন্ত তাঁর বই এর সংখ্যা ষাট। তাঁর প্রতিটি লেখাই আলাদা আলাদা ভাবে পাঠকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁর কোন সাহিত্য খ্যাতি হয়নি। প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা তাঁকে পাত্তা দেন না। বড় সাহিত্য সভাতেও তিনি কল্কে পান না। সম্পাদকেরা তাঁর কাছে লেখা চান না। বরং তাঁকে দেখলে বিব্রত বোধ করেন। তিনিও আত্মমর্যাদা বোধের জন্য তাদের পরিহার করেন। এখন তিনি ছোট কাগজগুলিতে লেখেন। কিন্তু এই প্রবীণ বয়সেও এত ব্যর্থতার পরও তাঁর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি। তিনি লেখা বন্ধ করেননি। অসফল ব্যক্তি যদি একবার প্রকাশ্যে বলে ফেলেন আমার আত্মবিশ্বাস আছে তাহলে লোকে ভাববে তিনি অহংকার করছেন। আর সফল ব্যক্তি যদি ঘোষণা করেন, আমার আত্মবিশ্বাস আছে তাহলে লোকে তাঁকে বলবে দেখেছ কী বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

অসফল ব্যক্তিরই বেশি করে আত্মবিশ্বাস দরকার কিন্তু তার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছুই বলার অধিকার নেই। আত্মবিশ্বাস কোনমতেই কিন্তু অহংকার নয়। অহংকার মানে নিজে যা নই, তা ভাবা অথবা যা আছে সেটা নিয়ে গর্ব করা। কিন্তু গর্ব করার মত মানুষের আর কি আছে—কারণ সাফল্যের সঙ্গে তার কর্মপ্রচেষ্টার সব সময় সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কাজ করেও, চেষ্টা করেও মানুষ সফল হয়না। বহু লোক খোশামোদ করে, পরিস্থিতিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে, সফল জনসংযোগের মাধ্যমে, অথবা বহু টাকা ও সময় খরচ করে, কৌশল করে সাফল্য অর্জন করতে পারে। ঠিক জায়গায় তৈলমর্দন না করার জন্য, উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে স্তাবিকতা না করার জন্য, ন্যায় ও নীতির পথ থেকে ভ্রষ্ট না হবার জন্য, **দুর্নীতির স্রোতে গা ছেড়ে দিতে অস্বীকার করার জন্য অনেক যোগ্য লোকের জীবনে সাফল্য নাও আসতে পারে। সফল ও কৃতী ব্যক্তি মানেই দেবতা নন, প্রণম্য নন। অসফল ব্যক্তি মানেই ঘৃণ্য নন। সাহেব যাকে পছন্দকরেন না কর্মচারীরা তাঁকে পারলে কাঁচা খেয়ে ফেলেন। এক্ষেত্রে ওই সাহেবের বিরাগভাজন ওই ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসে কি চিড় ধরবে ?**

প্রকৃত আত্মবিশ্বাস হলে তাতে চিড় ধরা উচিত নয়। হীরের উপর যেমন আঁচড়ের দাগ কাটে না। হীরেকে যেমন লোহা দিয়ে কাটা যায়না, তেমনি প্রকৃত আত্মবিশ্বাসকে উপেক্ষা দিয়ে কাটা যায়না।

॥ এগারো ॥
পোশাক দিয়ে মানুষ চেনা যায়

মানুষ বিচার করতে গিয়ে অধিকাংশই যে প্রথম দর্শনের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হন সে সম্পর্কে আগেই বলেছি। একজন মানুষ সম্পর্কে অন্য মানুষের ধারণা গড়ে ওঠে তার চেহারা, পোশাক আশাক, আচার ব্যবহার চাকরি বা পেশা, আর্থিক অবস্থা, জীবনচর্যা (কেমনভাবে ব্যক্তিগত জীবন যাপন করেন) ও জনপ্রিয়তার উপর। কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই নানা ফাঁক থেকে যায়। মানুষের প্রকৃত বিচার যেন কিছুতেই হয়ে ওঠে না। আসলে মানুষ বিচার করার একটা বিশেষ কোনও কষ্টিপাথর নেই। যে ওই পাথরে ঘসলেই একজন মানুষকে বিচার করা যাবে। মানুষ চিনতে গেলে তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। একটি মাত্র বিষয় দিয়ে নয়, বিভিন্ন বিষয় দিয়ে তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়।

প্রথমে পোশাক আশাকের কথায় আসা যাক। পোশাকের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি মানুষের পোষাক পরার একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। পুরুষেরা কেউ পাজামা পাঞ্জাবি পছন্দ করেন। কেউ ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছুই পরতে চান না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ধুতির সঙ্গে শার্ট পরতেন। আগে এটি বেশ প্রচলিত ছিল। ধুতির ওপর গলাবন্ধ কোটও চলত। আমাদের সময় স্কুলে (পঞ্চাশের দশকে) কেউ ফুলপ্যান্ট পরে আসত না। বড় ছেলেরা পাজামার ওপর শার্ট না হয় ধুতি পরত। এখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ছাত্র ধুতি পরেনা। মেয়েরা শাড়ির বদলে দ্রুত জিনস ও শালোয়ার কামিজ পরছে। কিন্তু পোশাক যে যাই পরুক না কেন, কীরকম ভাবে পরছে সেটাই দেখার। শাড়িও অশালীনভাবে পরা যায় আবার যারা শালোয়ার কামিজ পরে তারা যে সবাই অশালীন তাও নয়। কিন্তু স্থান কাল পাত্র অনুসারে শোপাক পরাটাই রুচিশীলতার লক্ষণ। শ্রাদ্ধবাড়িতে যা পরা যায়, বিয়ে বাড়িতে তা পরা যায় না। বয়স অনুসারে, ফিগার অনুসারে পোশাক পছন্দ করতে হয়। বৃদ্ধেরা যদি চটকদারি পোশাক পরে, বৃদ্ধারা যদি যৌন উত্তেজনাকর পোশাক পরে সেটা কুৎসিৎ মনে হয়। কলেজে বিশেষকরে কো-এডুকেশন কলেজে এমন পোশাক কারও পরা উচিত নয় যা যৌন উত্তেজক বলে মনে হতে পার। পোশাক নির্বাচন, তা পরার স্টাইল, এমনকি পোশাকের রঙ নির্বাচনের ওপরেও পুরুষ ও মহিলাটি কেমন তা অনেকখানি বোঝা যায়।

১. এলোমেলো পোশাক : দামী কিন্তু আধময়লা পোশাক বা ইস্ত্রির ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাওয়া জামা প্যান্ট বা কাপড় পরে বহুলোক ঘোরেন। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে

অলস প্রকৃতির, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ও অল্পে সন্তুষ্ট।

২. ছিমছাম অথচ দামী পোশাক : এই পোশাক পরেন অনেকে। মেয়েরা হয়ত একটি শাদা ঢাকাই বা দামী তাঁতের শাড়ি পরলেন। পুরুষেরা একটি ট্রাউজার্সের সঙ্গে তসর কিংবা র সিল্কের একটি বুশশার্ট পরলেন। পায়ে একটি কাবলি জুতো খুব সাদাসিধে নিউকাট।

এঁরা স্বভাবতই রুচিশীল ও ভীষণভাবে আত্মসচেতন। সাধারণত দেখা যায় জীবনের কোনও একটা দিকে তারা প্রচণ্ডভাবে সফল। সেজন্য আত্মবিশ্বাস প্রবল। সাধারণ বড় শিল্পপতি বা ধনী পরিবারের অনেকেই দামী অথচ ছিমছাম পোশাক পরেন। আই এ এস অফিসারদের অধিকাংশকেই দেখবেন ছিমছাম পোশাক পরতে।

৩. দর্শনধারী পোশাক : দর্শনধারী পোশাক পরে নিজেকে আরও চিহ্নিত করতে কে না চান। তবে যাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে তাঁরা জমকালো পোশাক পরা পছন্দ করেন। এঁদের মধ্যে ধনী ও সাধারণ লোক সবাই পড়েন। রাজা মহারাজা জমিদার শ্রেণীর অবচেতন মনের ধারণা তাঁদের দামী জমকালো পোশাক না পরলে তাঁরা যে সাধারণ থেকে আলাদা এটি লোকের কাছে স্পষ্ট করে ও জমকালো পোশাক পরে বার হন, যাতে পর্দার চেহারার সঙ্গে তাঁদের আটপৌরে চেহারার ফারাক লোকে না ধরতে পারে। কারণ বহু চিত্রতারকা ও চিত্রাভিনেত্রীর চেহারাই সাদামাঠা। তাঁদের চড়া মেকআপ ও ফোটোজেনিক মুখের জন্য ছবিতে অত আকর্ষণীয় দেখায়। এজন্য অনেকে সাধারণের সামনে বার হননা। বার হলেও চোখে কালো চশমা পরে বার হন। এক শ্রেণীর অঙ্কন শিল্পী বা চিত্রশিল্পী, বুদ্ধিজীবী বিচিত্র ধরনের পোশাক পরেন। হাঁটু পর্যন্ত ঝুল পাঞ্জাবি। ট্রাউজার্স এক মুখ দাড়ি, বড় বড় চুল। এখানেও অবচেতন মনে দুটি বস্তু কাজ করে। সাধারণ থেকে তিনি যে স্বতন্ত্র সেটি বুঝিয়ে দেওয়া। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এবং তিনি যে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী তার প্রমাণ দেওয়া।

পোশাকের ফ্যাশন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মনস্করা যে কোনও নতুন পোশাককে সাদরে গ্রহণ করেন। সাধারণত বাচ্চাদের ওপর দিয়ে প্রথমে এই নতুন ফ্যাশন পরীক্ষা করা হয়। তারপর টিন এজার ছেলেমেয়েরা এই পোশাক গ্রহণ করে। আমার নিজের ধারণা আগামী শতকের গোড়াতেই শিক্ষিত বয়স্ক মহিলাদের ৭০ শতাংশই শালোয়ার কামিজ পরবে। তবে শাড়ি একেবারে উঠে যাবেনা। জাপানে কিমানো একেবারে উঠে যায়নি। সেটি এখন ফ্যান্সিড্রেসে পরিণত হয়েছে।

পুরুষের ফ্যান্সিড্রেস

অনেক সময় পোশাকের সঙ্গে ধর্মের গোঁড়ামিও যুক্ত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে পোশাক দেখে একজনকে গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমান বলে ধরাযায়। বাংলাদেশে মুসলমানরা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে ধুতি হিন্দুয়ানির প্রতীক, এই মনোভাব সমাজের সমস্ত স্তরে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে প্রগতিশীল মুসলমানরাও সে দেশে ধুতি পরা বন্ধ করে দিলেন। এমনকি হিন্দুরাও হিন্দুয়ানি প্রকট হয়ে ওঠার ভয়ে হোক বা অন্য কারণেই হোক, পাজামা পাঞ্জাবি ধরলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বহু মুসলমান ধুতি পাঞ্জাবি পরে থাকেন। হিন্দুরাতো অনেকে পাজামা পাঞ্জাবি পরে এখন সামাজিক অনুষ্ঠানেও যাচ্ছেন। কিন্তু সেটি কাজের সুবিধে হয় বলে। পাজামা পাঞ্জাবি কাঁধে একটি শান্তিনিকেতনি ঝোলা, পায়ে স্লিপার এখন এদেশে তরুণ লেখক শিল্পী কবিদের পোশাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোশাকের নানা স্টিরিওটাইপ আছে। প্রতিটি মানুষই সে স্টিরিওটাইপের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে পোশাক পরে। সেজন্য কে কোন পোশাক পছন্দ করছে তা দেখে সে কেমন মানসিকতার লোক বলে দেওয়া যায়। মস্তান ও গুণ্ডারা কখনই কবি সাহিত্যিকদের মত পোশাক পরবেনা। আবার একজন বিজনেস এগজিকিউটিভ বা শিল্পমালিক কখনই রঙচঙে পোশাক পরবেন না। তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শফরি স্যুট পরেন। শাফরি স্যুট হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক। দেখে মনে হচ্ছে আপনিও নিশ্চয়ই আমাদের অফিসে কাজ করেন।

দেখে মনে হচ্ছে আপনিও নিশ্চয়ই আমাদের অফিসে কাজ করেন।

শ্রেণীহীন সমাজে পোশাকের বিশেষ বৈচিত্র্য থাকেনা। চীন যতদিন শ্রেণীহীন ছিল ততদিন চিনের মানুষ সাধারণ পোশাকে অভ্যস্ত ছিল। গেঞ্জি ও খাকির হাফপ্যান্ট পরে চিনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কারখানায় অফিসে কাজ করতে যেতেন, একজন ম্যানেজার ও একজন শ্রমিক একই পোশাক পরতেন। এখন পশ্চিমী ভোগবাদ এসে সব চুরমার করে দিয়েছে। ধনী দরিদ্রের মধ্যে ফারাক বেড়েছে। এখন যাদের হাতে টাকা আছে তারা পোশাকের পিছনে অকাতরে ব্যয় করছে। পশ্চিমী নানা দামী প্রসাধন দ্রব্যে বাজার ছেয়ে গেছে।

তবে ব্যক্তিত্ব রুচি ও মানসিকতা অনুসারেই যে লোকে পোশাক বাছাই করে তার প্রমাণ আপনি যদি বিভিন্ন ধরণের পোশাক কাউকে বিনামূল্যে তুলে নিতে বলেন, তাহলে প্রত্যেকে যে ধরণের পোশাক পরে থাকেন সেই ধরণের পোশাকই বেছে নেবেন। যিনি ধুতিপাঞ্জাবি পরেন, তাকে যদি স্যুটের কাপড় উপহার দেন তাহলে তা যত দামীই হোক, তা তিনি গ্রহণ করবেন না। প্যান্ট পরতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের শান্তিপুরের ফিনফিনে ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি রোজ পরাতে পারবে কী ? অনেকে সচেতনভাবে আদর্শগত কারণে পোশাক বদল করেন। যেমন কেউ নিজেকে ভক্তিমার্গের পথিক প্রমাণ করার জন্য হয়ত লাল পাঞ্জাবি পরলেন। এটাই তিনি সব সময় পরবেন। বড় বড় চুল ও দাড়ি রাখলেন। কপালে ফোটা কাটলেন। তিনি কী ভণ্ড ? সাধারণতঃ সচেতনভাবে কোনও মানুষ যদি কোনও বিশেষ স্টিরিওটাইপের ভাবমূর্তি নিজের মধ্যে প্রকাশ করতে চান, তাহলে তাঁকে ওই স্টিরিওটাইপের সমস্ত গুণও আত্মীকরণ করতে হবে। তা না করলে তাঁর আচরণে ও কথায় ভীষণ ফারাক থেকে যাবে। তখন লোকে তাকে ভণ্ড বলবে।

যেমন যদি আপনি কপালে সিঁদুর দিলেন বা ফোটা কাটলেন, বাবাজী বা কাপালিকদের মত পোশাক পরলেন, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে ছোটখাটো সংকীর্ণ বুদ্ধির ওপরে উঠতে পারলেন না। সেক্ষেত্রে লোকের কাছে ভণ্ড আখ্যা পেতেই হবে। গৈরিক পোশাককে সন্ন্যাসীরা এজন্য এত মর্যাদা দেন। বহু ধর্মসম্প্রদায় প্রথমেই কাউকে গৈরিক পোশাক দেননা। প্রথমে শাদা পোশাক দেন। তারপর গৈরিক পোশাক দেন। রামকৃষ্ণ মিশানে গেরুয়া পেতে গেলে অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশে ইউনিফর্মের উপর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। কারণ সেখানে ইউনিফর্মই একটি প্রতীক। ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় বহু কাজই করা নিষেধ যা ইউনিফর্ম খুলে শাদা পোশাকে নিষিদ্ধ নয়। যেমন পুলিশের মধ্যে ইউনিফর্ম পরে কর্তব্যরত অবস্থায় ধূমপান নিষেধ। ইউনিফর্ম পরলে তা ফুল ইউনিফর্ম হওয়া চাই। তা না হলে এতে পোশাকের অমর্যাদা করা হয়।

যে কেউ আর্মি কিংবা পুলিশের ইউনিফর্ম পরে দেখুন, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। তার মধ্যে স্বতন্ত্র্যবোধ ও মর্যাদাবোধ এসেছে। পোশাকের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ও মনের সম্পর্ক এভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ঢিলে ঢালা পোশাক পরলে যেমন মনটা হাল্কা হয়, রিলাক্স করার সময় ঢিলেঢালা পোশাকই দরকার, দরকার রাতের ঘুমের জন্য—তেমনি প্যান্ট শার্ট কোট টাই পরে পাঁচতারা হোটেলে ঢুকতে আপনি যতখানি স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন, ক্যাজুয়াল পোশাকে ততখানি নয়। স্কুলে ছেলেদের স্কুল ড্রেস তুলে দিন। তাদের যা খুশি পোশাক পরে আসতে বলুন, দেখবেন স্কুলে শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। আসলে স্কুল ড্রেস. ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একাত্মভাব জাগিয়ে তোলে। পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াটাও ভাল হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন কলেজেও ইউনিফর্ম আছে। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডের ছাত্রদেরতো রাস্তায় বেরুতে গেলেও কলেজের গাউন পরে বেরুতে হয়। যাতে শহরের লোকেরা তাদের সহজেই অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ছাত্র বলে চিহ্নিত করতে পারে। কর্তৃপক্ষও মনে করেন এই ইউনিফর্ম ছেলেদের গায়ে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তারা সমাজের কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেনা। কাজেই পোশাক শুধু একটি আচ্ছাদন নয় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীকমাত্র নয়—পোশাক ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষের মনের আয়না। আপনি বলতে পারেন আমি অত্যাধুনিক পোশাক পরব। ট্রাউজার্সের উপর পাঞ্জাবি পরব, ধুতির ওপর কোট পরব, বিচিত্র রঙের হাওয়াই শার্ট বুড়ো বয়সেও গায়ে দিয়ে জওয়ান সাজব। আপনি বলতে পারেন আমি ছুচলো ড্রেন পাইপপ্যান্ট পরব, চোস্ত পরব, লুংগি পরব। মেয়েরা বলতে পারে আমরা হাত কাটা ব্লাউজ পরব, বেলবটস পরবো, শালোয়ার কামিজ পরব, মিনিস্কার্ট পরব আমাদের খুশি! কারও বলার কিছু নেই।

সত্যি বলার কিছু নেই। বলা উচিতও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত কারও পোশাকের ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তা সে বাবা মা বা কর্তৃপক্ষ যেই হোক। পোশাকতো আমরা নির্বাচন করিনা, নির্বাচন করে আমাদের অবচেতন মন। আমাদের মানসিকতা, অবরুদ্ধ কামনা বাসনা, ব্যক্তিত্বের ঘাটতি, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সমস্তই পোশাকের মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়। পোশাকের মধ্যদিয়ে আর্থিক শ্রেণী নির্ণয় করা এখন আর সম্ভব হয়না। তবে মানসিক শ্রেণী নির্ণয় করা সম্ভব হয়। একজন শান্ত নীরিহ মানুষ ও একজন উগ্র মানসিকতার ব্যক্তি, একজন রুচিশীল ও একজন সেক্স ম্যানিয়াককে পোশাক দেখেই আলাদা করা যায়। রাষ্ট্র ও সমাজ আদর্শ পোশাকের নমুনা ঠিক করে দিতে পারেন না। যে যেমন মানুষ সে সবসময়ই তেমনভাবে নিজেকে ব্যক্ত করার মাধ্যম খোঁজে। পোশাকের মধ্য দিয়েই সে নিজেকে ব্যক্ত করে। যাঁরা পোশাকের একটি সমতা বজায় রাখেন—অর্থাৎ রোজই একই পোশাক পরেন, বুঝতে হয় তিনি প্রত্যয়নিষ্ঠ, আপন আদর্শে অবিচল। কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব একমাত্র রাজনৈতিক জগতেই দেখা যায়। নেহরু তাঁর কোটের পকেটের গোলাপটিকে শুকোতে দেননি। একই ধরনের পোশাক তিনি পরতেন।

জ্যোতি বসুও চিরকাল ধুতি পাঞ্জাবি থেকে বিচ্যুত হননি। এই পোশাক আনুগত্য প্রবল আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

॥ বারো ॥
সফলমানুষই সকলের প্রিয়মানুষ

আপনার আমার সঙ্গে প্রতিদিন কত লোকেরই তো আলাপ হয়। কিন্তু আমরা তাকেই পছন্দ করি যে সফল। সুতরাং মানুষ চিনতে গেলে অনেকে আগে বিচার করতে বসেন লোকটি সফল কিনা।

আমরা সব সময় সফল লোককেই নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য খুঁজে বেড়াই, বাজারে আলু কিনতে গেলে সেই দোকানেই যাই যে দোকানদার একজন সফল আলু বিক্রেতা। যার দোকানে সবসময় ভিড়। তার পাশেই একজন আলু বিক্রেতা বসে আছে। তার দাম ও গুণগত মান একই। কিন্তু লোকে তার কাছে যাচ্ছেনা। যাচ্ছে এক বিশেষ আলুওয়ালার কাছে। একবার সফল হতে পারলে তখন সবাই মিলে সফল লোকটারই পিঠ চাপড়াতে থাকে।

গরিব মানুষ এমনকি গরিব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সকলে এড়িয়ে চলে। বড়লোকদের সঙ্গে সবাই খাতির জমাবার চেষ্টা করে। কারণ সফল হতে পারেনি বলেই একজন গরিব। দুই বন্ধু একই সময় জীবন শুরু করল। একজন

দাড়াতেই পারল না। দারিদ্র্যের জ্বালায় পড়াশোনা বেশি করতে পারল না। আর বেশিদূর পড়তে পারল না বলে সে ভাল চাকরি পেলনা। ভাল চাকরি পেলনা বলে সে তার জীবন যাত্রার মান বাড়াতে পারল না। তার ছেলেমেয়েরা মানুষ হল না। তারাও গরিব হয়ে রইল। তাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া গেল না। অনেকে নিরক্ষরই থেকে গেল। একটাই কারণ একটা সাফল্য অনেকগুলো ব্যর্থতার দরজা খুলে দেয়। কিছুদিন আগে আমার কাছে একটি মেয়ে এসেছিল। মেয়েটি ভূগোল অনার্সে ৫৭ শতাংশ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও এম এ তে ভর্তি হতে পারেনি। তার এই ব্যর্থতার জন্য সে রেগেমেগে তার ইউনিভার্সিটির সমস্ত মার্কশিট ও সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এখন এর ফলে সে আর কোথাও ভর্তি হতে পারল না। ব্যর্থতার দুষ্টচক্রে নিজেই আটকে পড়ল।

সাফল্য ঠিক এর উলটো। যে ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, সবাই তাকে সাহায্য করে। সে বিনা আয়াসে পরবর্তী কোর্সগুলিতে ভর্তি হতে পারে। সবাই তাকে খাতির করে। সকলের কাছে সহযোগিতা পাওয়ায় তার রেজাল্ট আরও ভাল হয়। যার টাকা আছে সে টাকা লগ্নী করে সেই টাকাকে বাড়িয়ে আরও টাকা করতে পারে।

একজন সফল মানুষকে আমরা চিনতে পারি কতগুলি লক্ষণ দেখে। তার মধ্যে একটি হল জনপ্রিয়তা। একজন জনপ্রিয় ব্যক্তির জনপ্রিয়তার মূলে আছে সকলের সঙ্গে তার মেশবার ক্ষমতা আর সর্বদা ঝকঝকে ভাব বা হাসি মুখ। তাঁর মনের ভাব যাইহোক তিনি সেটি গোপন করে নিতান্ত অপছন্দের লোকের সঙ্গেও হাসি হাসি মুখ করে কথা বলেন। সাধারণ মানুষ মজার লোককে চায়। যেকথা বলে হাসাতে পারে, ভাল গল্প করতে পাবে। এমন লোককে চায় যে পরোপকারি, চরিত্রবান, খাঁটি মানুষ। গম্ভীর ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লোকের পক্ষে জনপ্রিয় হওয়া সম্ভব নয়। তাই গম্ভীর মানুষদের লোকে ভুল বোঝে। এর ফলে তার ভাল কাজেরও মূল্যায়ণ হয়না। আর যতই তিনি ব্যর্থ হন ততই তিনি আরও গম্ভীর ও বদমেজাজী হয়ে যান। আরও বেশি অমিশুক প্রকৃতির হয়ে পড়েন। তাই কোনও অসাল লোক দেখলেই খুব তলিয়ে বিচার করার চেষ্টা করবেন লোকটি অসফল কেন। তার প্রতি আর পাঁচজনের আচরণ দেখে কখনও বিচার করবেন না। তাহলে তো ডাইনি বলে যেসব হতভাগিনীকে হত্যা করা হয়, বলতে হয়, তারা সত্যি সত্যিই ডাইনী। আর বহু লোকের কাছে একজন জনপ্রিয়তা হারালেই যদি বলতে হয় সেই মানুষটিরই দোষ তাহলে তো ডাইনী হত্যাকে সমর্থন করতে হয়। কারণ সেখানেও তথাকথিত গণবিচারের মাধ্যমে কয়েকশত লোক মিলে একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে। একটি ব্যর্থতা ধীরে ধীরে বহু ব্যর্থতাকে ডেকে আনে। উপজাতি সমাজে দেখা যায় সাধারণতঃ সন্তানহীনা ও বিধবা নিঃসহায়া নারী যখন ব্যক্তিজীবনের নানা দুঃখে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মধ্যে

নিজেকে গুটিয়ে নেয় তখন তার আচরণকে সমাজ নিন্দার চোখে দেখতে থাকে। সমাজের সঙ্গে তার কমিউনিকেশন গ্যাপ গড়ে উঠতে থাকে। অবশেষে সে বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। এই অবস্থায় তার অস্বাভাবিক আচরণকে অলৌকিক আচরণ বলে সাব্যস্ত করা হয়।

এইজন্য সমস্ত মানুষেরই উচিত যথা সম্ভব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া। প্রতিটি বয়সেই বন্ধু দরকার। এই বন্ধুর সংখ্যা দিয়ে ও গুণ দিয়ে ব্যক্তির জনপ্রিয়তা বিচার হয়। একজন স্কুলের ছেলে বা মেয়ের যত বেশি সংখ্যায় বন্ধু থাকবে ততই সেটি তার জনপ্রিয়তার পরিচয়। আর তার জনপ্রিয়তার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে তার সাফল্য। তাই সাফল্য ও জনপ্রিয়তা এক রকম হাত ধরাধরি করে চলে। যিনি জনপ্রিয় তাঁকে অযাচিত ভাবে পাঁচজন সহযোগিতা করে। আর তিনি যত বেশি সহযোগিতা পান তত বেশি তার উচ্চাশাগুলি পূরণ করতে পারেন।

সাফল্যের কতগুলি বাহ্যিক লক্ষণ আছে সেগুলিকে 'স্ট্যাটাস-সিম্বল' বলে। এই 'স্ট্যাটাস-সিম্বল' থেকে একজনের সাফল্য মাপা যায়। স্ট্যাটাস সিম্বলগুলি হচ্ছে অভিজাত এলাকায় আধুনিক বাড়ি বা ফ্ল্যাট—পৈত্রিক বাড়ি নয় নিজস্ব বাড়ি বা ফ্ল্যাট। সম্মানজনক পেশা, (এটি কাল ভেদে ও সমাজভেদে এক একরকম) যেমন এক সময় সরকারি চাকরি ছিল স্ট্যাটাস সিম্বল। এখন রাজনীতিবিদদের হাতে আই এ এস বা স্টেট সিভিল সার্ভিসের লোকেরা কেরাণীতে পরিণত হয়েছেন। তাই এখন একটি মালটি ন্যাশনাল কম্পানির এগজিকিউটিভের পদ স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে অনেক জোরদার।

স্ট্যাটাস সিম্বলের একটি হচ্ছে গাড়ি। এখন মারুতি দুহাজার নয়—কন্টেসা অথবা এসি মারুতি। আগে একটি অ্যালসেসিয়ান থাকলেই সেটি স্ট্যাটাস সিম্বল হত—এখন অ্যালসেসিয়ান নয়—ডোবারম্যান হল স্ট্যাটাস সিম্বল। প্রথমে টিভি থাকাটাই স্ট্যাটাস সিম্বল ছিল, তারপর রঙিন টিভি থাকাটা। এখন বিবিসি, স্টার টিভি নেওয়া এবং ভিসি আর ভি সি পি শোনা স্ট্যাটাস সিম্বল। বাড়িতে নিয়মিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আপ্যায়ণ করা ও তাদের স্কচ ও কাবাব পরিবেশন করা স্ট্যাটাস সিম্বল। আগে কারও হঠাৎ পয়সা হলে তিনি দানধ্যান করতেন, বিয়ে শ্রাদ্ধে বহু বাঙালি ভোজন করাতেন। সেটাই ছিল স্ট্যাটাস সিম্বল। এখন স্ট্যাটাস সিম্বল হল, মদের পার্টি দেওয়া। সেখানে কে কতজন আই পি এস, আই এ এস অফিসারকে হাজির করতে পারলেন। এখন কে কোথা থেকে অফুরন্ত টাকা পয়সা পাচ্ছেন কেউ তার খোঁজ রাখেনা। একজন হঠাৎ বড়লোক সম্পর্কে আমিই হয়তো আড়ালে বলবো লোকটি চুরি করে বড়লোক হয়েছে,কিন্তু সে কোন পার্টিতে নেমন্তন্ন করলে আপনি আমি সবার আগে ছুটে যাবো। তার পয়সায় চব্যচোষ্য খেয়ে, পান করে তারই কোনও বৈষয়িক উপকার করে দিয়ে চলে আসব। সাফল্যের এটাই হল মাপকাঠি। একজন সফল ব্যক্তি সবাইকে চুম্বকের মত

আকর্ষণ করে। একবার নাম হয়ে গেলে লোকে তার কাছে পাগলের মত ভিড় করে। বড়বড় ডাক্তারদের চেম্বারে গিয়ে দেখেছেন একশ দেড়শ দুশো টাকা ফিজ দিয়ে দেখাবার জন্য লোকে মাসের পর মাস অপেক্ষা করছে। তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন হয়তো বেলা চারটেয়—আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর দেখা হল বিকেল ছটায়—তাও পাঁচ মিনিটের জন্য। মামুলি পরীক্ষা। মামুলি ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কাকে দেখাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলে আপনি বলবেন, ডাঃ অমুককে। তাতেই আপনার তৃপ্তি।

আমাদের দেশের বিবাহিতা মহিলাদের আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় স্বামীর নামটা আগে বলা হয়। উনি অমুক বিখ্যাত লোকের স্ত্রী। অনেক সময় দেখেছি স্বামী বিখ্যাত লোক—ধরুণ, নাম তারাপদ দাস। বলা হল, ইনি মিসেস তারাপদ দাস।

একজন জ্বলজ্যান্ত শিক্ষিত মহিলা গদগদ হয়ে নমস্কার করলেন। বিখ্যাত স্বামীর স্ত্রী হওয়া স্ট্যাটাস সিম্বল। বহু শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান পুরুষ নির্দ্বিধায় স্বল্প শিক্ষিত অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতা বিখ্যাত মহিলা স্বল্প শিক্ষিত একজন সাধারণ পুরুষকে বিয়ে করেছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল। কারণ রূপবতী স্ত্রী স্ট্যাটাস সিম্বল হতে পারে কিন্তু স্ত্রীর কাছে স্বামীর ঐশ্বর্য্যই (রূপ বা গুণ নয়) স্ট্যাটাস সিম্বল। যে মেয়ের যত বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয় সেই মেয়ে তত নিজেকে সফল বলে মনে করে। বিশেষ করে তার বাবা মা তো এটা করেই।

সাফল্য

মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার নানা দিক আছে। যেমন আগে যে সাফল্যের কথা বললাম সেই সাফল্য হল বৈষয়িক সাফল্য। আবার সামাজিক সাফল্য ও

রয়েছে। সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে আমি গ্রহণযোগ্য কিনা। সমাজের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য লোকে অবসর সময় ক্লাবের সদস্য হয়। সমিতি করে। পুজো কমিটিতে যোগ দেয়। যে অবসর সময় বাড়িতে একা একা কাটায় বা অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসে আর বাড়ি থেকে বেরোয় না বুঝতে হবে সে সামাজিকভাবে ব্যর্থ মানুষ। সামাজিকভাবে ব্যর্থ মানুষেরা পরিবারের দায় দায়িত্ব বেশি করে পালন করে। সে ছেলেমেয়েদের পড়ায়। বাড়ির ঘর কন্নার কাজে বউকে সাহায্য করে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প গুজব করে। আত্মীয় স্বজনের সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যায়। বউকে নিয়ে নিয়মিত সিনেমায় যায়। সামাজিক ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যই লোকে বেশি করে গৃহমুখী হয়। চিরদিনই তাই সমাজ ও গৃহ এই দুয়ের মাঝে টানাপোড়েন চলেছে। বৃহত্তর সমাজের ডাক যাদের কাছে তীব্র বলে মনেহয় তারাতো বিয়ে থাই করেনা, করলেও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আজকাল যারা রাজনীতি করে তারাতো সংসারের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই রাখেনা। তাদের 'আধা-সন্ন্যাসী' বলা যায়। মানুষ কীভাবে তার অবসর কাটাচ্ছে এদিয়ে তার রুচি, আর্থিক অবস্থা ও তার মানসিক গঠন সম্পর্কে জানা যেতে পারে। যেমন যারা বড় ক্লাবের মেম্বার হয় তারা ক্লাবে গিয়ে টেনিশ বা বিলিয়ার্ড খেলে। এরা পুরুষালি প্রকৃতির লোক। খেলাধূলা সাঁতার প্রভৃতি শরীর চর্চা অব্যাহত রাখতে চায়। বহুলোকের সঙ্গে মিশে কনট্যাক্ট বাড়াতে চায়।

মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষেরা একটা বয়স পর্যন্ত চায়ের দোকানে অবসর সময় আড্ডা মেরে কাটিয়ে দেয়। অল্পবয়সী বেকার ছেলেরা রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়। রোয়াকটি ইনফর্মাল ক্লাবে পরিণত হয়। সেখানে পরস্পরের মধ্যে নানা মতের আদান প্রদানও তারা করে।

যাদের টাকার দরকার তারা অবসর সময় অতিরিক্ত রোজগার করে অথবা কোয়ালিফিকেশন বাড়াবার চেষ্টা করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু পরিশ্রমী।

॥ তেরো ॥
এক একটি মানুষ এক এক রকম

মানুষ চেনার আগে আর একটা কথা মনে রাখবেন এক একজন মানুষ এক একরকম। প্রত্যেকটি মানুষ আর একজন থেকে আলাদা। এমনকি শ্যামদেশীয় যমজ যাদের দুজনের দেহ জোড়া ছিল, এক সঙ্গে তারাও দুজনে দুজনের থেকে আলাদা।

তবে আলাদা যেমন তেমনি মিলও আছে। দুঃখ শোক, হাঁসি কান্না রাগ, প্রেম

ভাললাগা ভালবাসার উৎস সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে একরকম। পুত্রশোক রাজারও যেমন, প্রজারও তেমন। বাঙালিরও যেমন, জার্মাণেরও তেমন, এস্কিমোরও তেমন। প্রেম করার রকমভেদ থাকতে পারে। কিন্তু আদিবাসী ও উচ্চশিক্ষিত উভয় সমাজেই নরনারীর প্রথম প্রেমের অভিব্যক্তি, ভাষা এবং প্রতিক্রিয়া একই রকম। কিন্তু এসবই কতগুলি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু মানুষের ভেতরটা প্রত্যেকেরই আলাদা। প্রেমের অভিব্যক্তি সকলের ক্ষেত্রে সমান। কিন্তু ভালবাসার নাম করে মেয়েটি ফ্লার্ট করছে কিনা, অথবা ছেলেটি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েটিকে ঠকিয়ে সরে পড়বে কিনা এটি এক একজনের মানসিকতার উপর নির্ভর করে। দুজন ভদ্র ও স্মার্ট লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ হল। দুজনেই আপনাকে নানা উপকার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপনি দুজনকেই বিশ্বাস করলেন। কিন্তু দেখা গেল একজন খাঁটি মানুষ। যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পালন করলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে আপনার জীবন ধারার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়জন একজন প্রতারক। তিনি আপনার সর্বনাশ করলেন।

আমি একই সঙ্গে প্রকৃত উপকারী ও প্রবঞ্চক উভয় লোকের পাল্লায় পড়েছি। প্রকৃত উপকারীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখনও অটুট আছে। কিন্তু প্রতারকরা আমার কিছুটা ক্ষতি করতেই আমি সতর্ক হয়ে গিয়েছি। তাদের সংশ্রব বর্জন করেছি। কিন্তু আমি জানি, বহু লোক প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

অনেকে বলবেন, প্রতারকদের কি আপনি চিনতে পারেননি ?

প্রতারকদের প্রথম চোটে চেনা খুব মুশকিল। অনেক সময় ভাললোকদেরই লোকে সন্দেহ করে। কারণ যে ভাল লোক সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে। আর যে প্রতারক সে জানে, কথা বেচে তাকে খেতে হবে। তাই সে ইচ্ছে করে বিনয়ের অবতার হয়। ভালমানুষদের কখনই টিপিক্যাল গোবেচারার মত দেখতে হয়না। কিন্তু প্রতারক ও শয়তানদের আত্মগোপন করে থাকতে হয় বলে সে গোবেচারার মত ভাবকরে থাকে। তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে, তার কথা শুনে লোকে প্রতারকের খপ্পরে পড়ে। ব্যবসায়ে অংশীদার হবার জন্য তার হাতে টাকা তুলে দেয়। ফ্ল্যাট কিনবার জন্য সর্বস্ব তুলে দেয় তার হাতে।

আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক সমস্ত সঞ্চয় ফ্ল্যাট কিনবার জন্য এক প্রতারকের হাতে তুলে দিলেন। ফ্ল্যাট আর হল না। শোকে দুঃখে ভদ্রলোক হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারাই গেলেন। আর একজন ভদ্রলাক দেখলাম ৭০ বছরের বৃদ্ধ। মহাকরণে এক পুলিশ অফিসারের ঘরে বসে ধর্ণা দিচ্ছেন। তিনিও এক প্রতারককে ফ্ল্যাট কেনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। তাঁর ফ্ল্যাট আর একজনকে বিক্রি করে দিয়েছে প্রতারক। ভদ্রলোক চারবছর ধরে টাকাও ফেরৎ পেলেন না। না, এঁরা কেউ মানুষ চিনতে পারেননি। পৃথিবীতে কেউ মানুষ চিনেছি বলে যদি

দাবি করেন আমি বলব তিনি মিথ্যা কথা বলছেন। মানুষ চিনলে পৃথিবীর ইতিহাসে 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটি আর থাকতনা। বিশ্বাসঘাতকতা সেই করে যে একদিন বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল। যে ছিল প্রাণের বন্ধু। ইতিহাসের দিকে তাকান—বৈরাম খাঁর মত একজন বিচক্ষণ মানুষ কী স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে নাবালক আকবরের হয়ে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করছেন, বড় হয়ে সিংহাসনে বসেই সে তাকে গুপ্ত ঘাতক দিয়ে হত্যা করাবে ? অথবা সাজাহান যদি তাঁর ছেলে ঔরংজীবকে চিনতেন তাহলে তিনি আগে থেকে সতর্ক হতেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টো কী—তাঁর সেনাপতি ও অকৃত্রিম বন্ধু জিয়াউল হককে চিনেছিলেন ? চিনলে জিয়াউল ক্ষমতা দখল করে ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারতেন না।

বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি অনেকক্ষেত্রে লোক চিনতে পারেন। কিন্তু সবাইকে চিনতে পারেন না। কারও প্রতি অন্ধ বিশ্বাস জন্মে যায়। কারও প্রতি মমতা জন্মে যায়। তাদের দোষ ত্রুটি তিনি দেখেও দেখেন না। এর ফলে ওই সব লোকের কাছ থেকেই তাঁর আঘাত আসে।

তবে কী সবাইকে অবিশ্বাস করতে হবে ? না, তাহলে তো সংসারে বাঁচা যায়না। কিন্তু মানুষ চেনার ব্যাপারে চোখকান খোলা রাখতে হবে। সেই যে রামকৃষ্ণদেবের গল্প মনে পড়ল। তিনি একজনকে জিলাপি কিনতে পাঠিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ দেখলেন, তাকে জিলাপি ঠকিয়ে দিয়েছে। তিনি তাকে খুব বকলেন। বললেন, তুই ঠকে এলি। যখন কিছু কিনবি গুণে দেখে নিবি। পারলে একটা ফাও নিয়ে আসবি।

তবে একজনকে দেখে আর একজন সম্পর্কে বিচার করা উচিত নয়। সেটা অবৈজ্ঞানিক। কারণ ওই যে বললাম প্রতিটি মানুষ আলাদা। বিদ্যাসাগর মশাই শেষ জীবনে মানুষ সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে মানুষের উপকার করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটি তাঁর মত লোকের উচিত হয়নি। বহু প্রতারক তাঁকে যেমন প্রতারণা করেছে তেমনি আবার হাজার হাজার মানুষ আজও তাঁকে আশীর্বাদ করছে। বিদ্যাসাগর মশাই টাকা পয়সা দিয়ে কতজনকে সাহায্য করে যেতে পেরেছিলেন—বড় জোর দুহাজার, পাঁচহাজার মানুষকে। তার বেশি নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দেবতার মত পুজো করেছে। তারাতো নিজেরা এক পয়সাও পায়নি।

আমি জীবনে বহু খারাপ লোক দেখেছি। সেই সমস্ত লোকেরা আমার প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে আজও করে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আমি কি মনে করব সব মানুষ খারাপ।

আপনারা যদি কখনও দেখেন মানুষ সম্পর্কে একটি কুৎসিৎ কদর্য অবৈজ্ঞানিক মানবতা বিরোধী মন্তব্য কোথাও টাঙানো আছে যার প্রথম লাইনটি হচ্ছে—

প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে
প্রশংসা করলে খোশামোদ ভাবে

ইত্যাদি।

ওই লেখাটি ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। ওই সংজ্ঞার দ্বারা সমগ্র মানবজাতির অপমান করা হচ্ছে। সমস্ত মানুষ সমান নয়। একশর মধ্যে ৯৯টি খারাপ মানুষ থাকতে পারে কিন্তু একটি ভালমানুষ আছে। ওই শততম মানুষটির শক্তি ৯৯টির চেয়ে অনেক বেশি। অন্ধকার ততক্ষণই তীব্র যতক্ষণ না আপনি একটি দেশলাই কাঠি জ্বালছেন। কিন্তু ওই দেশলাই কাঠি দিয়ে যদি ছোট একটি প্রদীপ ধরাতে পারেন তাহলে ওই প্রদীপের তেজ যতই কম হোক তা অত শক্তিশালী অন্ধকার অনায়াসে ভেদ করে আলো ফুটিয়ে তোলে। আবার ওই একটি প্রদীপ জ্বাললেই, তা থেকে লক্ষ লক্ষ মশাল ধরিয়ে নেওয়া যায়।

প্রতিটি মানুষ যে আলাদা তার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রতিটি নবজাতক শিশুর মধ্যেই দেখবেন। আপনাদের ধারণা সব শিশুই বুঝি সমান। মোটেই তা নয়। দেখবেন, ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব আলাদা আলাদা। কেউ বেশি কাঁদছে। কেউ চুপচাপ। কেউ খুব দ্রুত বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। কারও বা সময় লাগে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনা বলে তাদের গায়ে চর্মরোগ দেখা দেয়, সর্দি কাশি, পেটের গোলমালে ভোগে।

এই যে প্রত্যেকের মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন এর কারণ শিশুর জন্মের আগে ভ্রূণ অবস্থাতেই তার ব্যক্তিত্বের ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়। এটি গড়ে ওঠে বাবা মায়ের ক্রমোজোম থেকে। যেদিন ভ্রূণের সৃষ্টি হল সেদিনই বাবার থেকে ২৩ ও মায়ের থেকে ২৩ মোট ৪৬টি ক্রমোজম চলে এল ভ্রূণের মধ্যে। ওই ক্রমোজম গুলির মধ্যে আছে হাজার হাজার জিন। এক একটা জিন দৈহিক ও মানসিক জীবনের বীজ বহন করে। জিনগুলি আবার বংশানুক্রমে ক্রমোজোমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কয়েক পুরুষ আগের কয়েকটি জিন ও পরবর্তী প্রজন্মের দেহে চলে আসে। তাই ছেলেমেয়ে পুরোপুরি বাবা মায়ের কার্বনকপি হয়না, দুই ভাই, ভাইবোন একে অপরের থেকে আলাদা হয়। সবাইতো আর একই জিন পায়নি। যদিও ভাইবোনের মধ্যে অনেক কমন জিন থাকে। তাই ভাইবোনের চেহারা ও স্বভাবের মিল থাকে। আবার অনেকের থাকেওনা। উত্তমকুমার ও তরুণকুমার দুই ভাই দুই ভাই এর মধ্যে একমাত্র অভিনয় ক্ষমতা ছাড়া আর কোনও মিল আছে কী ?

হেরিডিটি ছাড়াও পরিবেশের একটা প্রভাব মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। তবে বৈজ্ঞানিকরা বলছেন পরিবেশ হেরিডিটিলব্ধ ব্যক্তিত্বের খুব বড রকমের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনা। হেরিডিটি ও পরিবেশ অনেক সময় দুষ্টচক্রের মত কাজ করে। ধরুন, রাম শ্যাম দুই ভাই। দুজনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেশ কিছু ফারাক। কারণ রাম কিছু জিন পেয়েছে যাতে তার মেধার খুব উন্নতি ঘটেনি

সে কিছুটা স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে। যেহেতু সে একটু স্থূলবুদ্ধি সেজন্য স্কুলে সে ভাল রেজাল্ট করতে পারেনা। পড়াশোনায় তার আগ্রহ নেই। কারণ সে দেখেছে চেষ্টা করেও কিছু মাথায় রাখতে পারছে না। অতএব সে খেলাধূলাতে বেশি মন দিচ্ছে। আর পড়াশোনা থেকে সরে আসার জন্য সে ক্রমশ হয়ে উঠছে বস্তুবাদী। শিল্পকলা সাহিত্যে তার রুচি নেই। সে কারখানায় কাজ করে। মারপিট করতে বা পেশীর জোর ফলাতে ভালবাসে।

অন্যদিকে শ্যাম এমন জিন পেয়েছে যাতে সে মেধাবী হয়েছে। ক্লাশে প্রথম হয়। ভাল গান করে, ছবি আঁকে। এসব গুণ সে তার মামার কাছ থেকে পেয়েছে। পড়াশোনায় ভাল হওয়ার জন্য সে প্রচুর বাইরের বই পড়ে। সে কবিতাও লেখে। খেলাধূলার চর্চা করার সময় পায়না। সেজন্য সে একটু রোগা। চোখে চশমা।

এখন এপর্যন্ত হেরিডিটির গুণাগুণ। এবার রাম ও শ্যামেব পরিবেশের উপরও তাদের ব্যক্তিত্ব অনেকখানি নির্ভর করবে। রাম যদি বস্তির পরিবেশে মানুষ হয় তাহলে তার পক্ষে ছেলেবেলা থেকে কুসঙ্গে পড়া স্বাভাবিক। হেরিডিটি অনুসারে কার কতখানি সম্ভাবনা ঠিক করে দেওয়া আছে। এবার পরিবেশ সেটা কমাতে বাড়াতে পারে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অংশ প্লাশ মাইনাস করা যায়। সরকার যদি ঠিক করেন দেশের সব মানুষকে এম এ পাশ করাবো। এরজন্য কাউকে বেতন দিতে হবেনা। উলটো আমরাই তাদের টাকা দেব। তাহলে সবাই নাম লেখাবে। কিন্তু কিছুতেই সবাই মাধ্যমিক পাশ করতে পারবেনা—এম এ তো দূরে থাক। প্রত্যেকেরই একটা লিমিট আছে। কত লোক গান শেখার চেষ্টা করে, গলা সাধে, কত লোক কবিতা লেখার চেষ্টা করে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ছবি আঁকা শেখে। কিন্তু নৈপুণ্য অর্জন করতে পারে কজন ?

আবার আসল কথায় ফিরে আসি, পরিবেশের প্রলেপ সত্ত্বেও অনেকের মনের ভেতরটা পরিবর্তন হযনা। বহু উচ্চশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। যতগুলো বধূ হত্যা হয়েছে, সবগুলিই ঘটেছে শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবারে। যাদের খাওয়া পরার অভাব নেই। যতগুলি ডিভোর্সের ঘটনা দেখেছি, দারিদ্র্য কোথাও কারণ নয়—যৌন অক্ষমতাও নয়, কারণ তাদের বাচ্চাও আছে।

আমি শিক্ষিতা মিষ্টি স্বভাবের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না দেখেছি, কারণ তাদের গায়ের রঙ কালো, মোটা টাকার পণ দিতে পারবেনা। আবার দুশ্চরিত্রা মেয়েদের টপাটপ বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তারা দিব্যি ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করছে। ফাঁকিবাজ অকর্মণ্য দুর্নীতিপরায়ণরা বসের ভীষণ বিশ্বস্ত। প্রতিবছর তাঁদের চাকরিতে উন্নতি হচ্ছে। তারপর আর একটা ভাল চাকরি যোগাড় করে তাঁরা চলে যাচ্ছেন। অন্যদিকে সতী সাধ্বী স্ত্রী, কর্তব্য পরায়ণ কর্মচারী আন্তরিক কর্মী পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন। মানুষ চিনলে কি মানুষের এই পরিণাম হয়।

॥ চোদ্দ ॥
আচরণ দেখেই মানুষ চেনা যায়।

পৌরাণিক গল্পে আছে দুই দেবতার মধ্যে লড়াই। ইনি বলছেন আমি বড়, উনি বলছেন আমি বড়। বিচারের জন্য তাঁরা শ্রীবৎস রাজার কাছে গেলেন। নারদ এসে আগেই খবর দিয়ে গিয়েছিলেন তাই শ্রীবৎস রাজা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দুটি সিংহাসন রাখলেন। একটি কাঠের, অপরটি সোনার। তার মধ্যে দুই দেবতা এসে হাজির। মহারাজ তাদের পাদ্য অর্ঘ দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বসতে বললেন। তাঁরা বসলেন।

দেবতারা বললেন, মহারাজ আমরা বসতে আসিনি। আমাদের মধ্যে কে বড় বলে দিন তখন শ্রীবৎস বললেন, আমি আর কী বলবো। আপনারা কে শ্রেষ্ঠ নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছেন নিজেদের অজান্তে নিজেদের আসন নির্বাচিত করে।

আপনাদের মধ্যে যিনি স্বর্ণ সিংহাসনে বসেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ আর যিনি কাষ্ঠ আসনে বসেছেন তিনিই নিকৃষ্ট। এই গল্পটির নানা প্রকারভেদ আছে। ঠিক যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারলাম না হয়তো। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে দেবতারা তাঁদের অজান্তে তাঁদের রুচিমত আসনে বসে কে কার চেয়ে বড় তার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

দেবতাদের এই গল্পেরমত মানুষও তার নিজের অজান্তে বিভিন্ন বিষয় পছন্দ করে তার রুচি, চিন্তাধারা, মানসিকতা, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। প্রতিদিন নিজের চেতন মনের অজান্তেই চলে এমন শত শত বাছাই।

আমি মাঝে মাঝে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাশে ভ্রমণ করি। দেখি মাত্র দশ পয়সার জন্য যাত্রীর বেশভূষার সেখানে কত তফাৎ। অর্থাৎ সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষ বা স্বচ্ছলদের মধ্যে মিতব্যয়ী মানুষজন সেকেন্ড ক্লাশে যাতায়াত করেন।

তেমনি পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেও সূক্ষ্মরূচির পরিচয় পাওয়া যায়। সংরক্ষণশীলতা, উগ্র আধুনিকতা, রুচিশীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, উচ্চ সংস্কৃতি, নিম্ন-সংস্কৃতি, শৌখিনতা, মিতব্যয়িতা সব কিছুই পোশাকের মধ্যে ফুটে ওঠে।

তেমনি আর কতগুলি জিনিস থেকে আপনি মানুষ চিনতে পারেন।

তার মধ্যে প্রথমেই পড়ে খবরের কাগজ।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, লোকে খবরের কাগজ পড়ে চিন্তাভাবনা নতুন করে তৈরি করেনা, চিন্তা-ভাবনা বিশ্বাস অনুসারেই যে তার মনোমত খবরের কাগজ বেছে নেয়। খবরের কাগজ তখন তার প্রচলিত চিন্তাভাবনাগুলিকেই পাকাপোক্ত করে দেয়। শুধু খবরের কাগজ নয়, লোকে বই বাছাই করেও এভাবে কেউ গল্প উপন্যাস বেশি পড়ে কেউ দর্শনের বই পড়ে, কেউ সাহিত্যের বই পড়ে, কেউ গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে। প্রত্যেকেই তার বই বেছে নেয়। রুচি,বয়স ও শিক্ষাদীক্ষা

অনুযায়ী। পুজোর সময় বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে রাজনৈতিক দলের প্রচার পুস্তিকার স্টল হয়। বিক্রিও তাদের মন্দ হয়না। এসব বই কারা কেনে ? বেশিরভাগই ওই দলীয় মতবাদে বিশ্বাসীরা। এইজন্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন আমাদের যা কিছু ধারণা তা নির্বাচিত অর্থাৎ সিলেকটিভ। এই নির্বাচিত ধারণার প্রভাবেই আমরা শুধু নির্বাচিত বই পড়ি, নির্বাচিত পত্রপত্রিকা বাছাই করি। কিন্তু তাহলে কি কোন লোক নেই যাঁরা পরস্পর বিরোধী বইপত্র বা সংবাদপত্র পড়েন না ? হ্যাঁ পড়েন। যেমন আমিই পড়ি। সব রকমের বই পড়ি। যেসব লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই, তাঁদের বইও পড়ি। আবার রোজ সব খবরের কাগজেই চোখ বুলোই। কিন্তু আমার মত যাঁরা লেখালেখি করেন তাঁদের সব কিছু পড়তে হয়, অথবা যাঁরা গবেষণা করেন, বা এমন চাকরি করেন যেখানে বিরোধীদের বক্তব্যটা জানাও দরকার হয়ে পড়ে সেখানে সবাইকে সবকিছুই পড়তে হয়। আমি তাঁদের কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি সাধারণ মানুষের কথা—তাদের ক্ষেত্রে 'সিলেকটিভ এক্সপোজার' হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারা সংবাদপত্র ম্যাগাজিন কেনেন তাঁদের রুচি ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে। সবদেশেই সংবাদপত্রের একটানা একটা চরিত্র থাকে। সংরক্ষণশীল মৌলবাদী অথবা প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনবাদী (র‍্যাডিক্যাল) অথবা সংবাদপত্রের একটা সূক্ষ্ম বা মোটা রাজনৈতিক সমর্থনও থাকে। শাসকদলের প্রতি নরম না নরম গরম অথবা একেবারে নির্দয় ? বিরোধীদের মত তুলোধোনা করে দেয় কী শাসকদলকে ? অথবা তথাকথিত গঠনমূলক সমালোচনা করে ?

যে যেমন সবোদপত্র পড়েন, বোঝা যায় তিনি তেমন লোক। যদি চটকদার জনপ্রিয় সংবাদপত্র হয়, তাহলে তিনি খুব শিক্ষিত নন। অথবা শিক্ষিত হলেও বিদগ্ধ ব্যক্তি নন। তিনি চাঞ্চল্য চান। উত্তেজনা চান। শস্তা বিনোদন চান। আবার উলটোটা আছে—উঁচু নাকের মানুষেরা। আমরা যাঁদের আঁতেল বলি। যাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশেন না, তাদের ধার ধারেন না। একটি প্রজন্ম ধরুন বাবা একটি কাগজ পড়তেন। তিনি ওই কাগজের চিন্তা ভাবনার মানুষ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলের চিন্তাভাবনা হয়তো আর একরকম। তিনি ওই কাগজ ছেড়ে দেবেন। আধুনিক সমাজে অনেক সংবাদপত্রের জন্ম হবে। কারণ মানুষের রুচিও সর্বদা স্থিতিশীল থাকবে না। আমি ক্রমাগত বদলাচ্ছি। আমার কাগজ যদি আমাকে আমার এই পরিবর্তনের ইন্ধন না যোগায় তাহলে আমি ওই কাগজ ছেড়ে দেব।

দ্বিতীয়ত ধর্ম দেখেও একটি মানুষের মানসিক গঠন মোটামুটি জানা যায়। যদিও এই জানাটার মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সব ধর্মই মানবতা, সহনশীলতা, জীবে দয়া শেখায়। সব ধর্মই একই নীতিবোধের কথা বলে। কোন ধর্ম কি বলে মিথ্যে কথা বলো। অপরকে ঘৃণাকরো। অপরের মেরে নাও। প্রায়

সবধর্মই পরলোক মানে। কোনও কোনও ধর্ম পুনর্জন্ম মানে। অধিকাংশ ধর্মেই একজন বা একাধিক ভগবান আছেন। সব ধর্মেই মহাপুরুষ আছেন। কিন্তু তা হলেও অনেক ধর্মে বিধিনিষেধগুলি খুব কড়া। অনুশাসন খুব তীব্র। অনেক ধর্ম প্রয়োজনে সহিংস হতে বলে। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করতে বলে। ধর্মে অবিশ্বাসীদের তারা ঘৃণা করতে শেখায়। এসব সংকীর্ণচিন্তা থেকে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম নেয়। সাম্প্রদায়িক লোকজন সব যুগে সব ধর্মের মধ্যেই ছিল, আছে এবং থাকবেও। কিন্তু কোনও কোনও ধর্মের অনুশাসন ও তার প্রবক্তারা মানুষকে ধর্মান্ধ করে তোলে।

দেখা যায় ক ও খ দুজন দুটি ধর্মমতে বিশ্বাসী। দুজনেই শিক্ষিত। উদার। কিন্তু প্রথমজন অনেকক্ষেত্রে যত সহজে ধর্মীয় অনুশাসনের উর্দ্ধে উঠতে পারছেন, দ্বিতীয়জন পারছেন না। এক জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছেন। কেন ? না, ছেলেবেলা থেকে তিনি কতগুলি ধর্মীয় সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছেন। অবচেতন মনে সেগুলি রয়ে গিয়েছে। দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মানুষেরা ছেলেবেলায় কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মানুষ হন। যখন আমরা বলি সে গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারে মানুষ হয়েছে তখন তার মূল্যবোধ সম্পর্কেও একটা ধারণা করে নিতে পারি। যদি শুনি একজন হিন্দু টোলে পড়াশোনা করেছেন, অথবা একজন মুসলমান মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত তাহলে উভয়ের মানসিক গঠন আলাদা হতে বাধ্য। একজন প্রটেস্ট্যান্ট ও একজন ক্যাথলিক। একজন শাক্ত ও একজন বৈষ্ণবের মূল্যবোধ অনেকটাই আলাদা।

আবার যিনি তথাকথিত যুক্তিবাদী বা নাস্তিক তাঁর মানসিকতা রুচি কথাবার্তা, আচরণ ও একজন ধার্মিক ব্যক্তির রুচি কথাবার্তা আচরণের সঙ্গে তফাৎ হতে বাধ্য। একজন নাস্তিক অনেকখানি বেপরোয়া, তাঁর মূল্যবোধ সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি ঈশ্বর পরলোক, পাপ পুণ্য কিছুতেই বিশ্বাস করেননা। তিনি শুধু বিচার করে দেখেন কাজটি প্রয়োজনীয়, তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দদায়ক কিনা। তিনি পরলোকে বিশ্বাসী নন বলে কর্মফল পেতে চান। যা কিছু ফল ইহলোকেই পেয়ে যেতে চান। সেকারণে তিনি ভোগবাদী। 'তথাকথিত' বললাম এই কারণে যে নাস্তিক্যদর্শন ও আস্তিক্য দর্শন দুটোই দর্শন। দর্শনের মধ্যে যুক্তি থাকে। ঈশ্বর আছেন যাঁরা বলেন, তাঁরাও যুক্তি সৃষ্টি করে প্রমাণ করেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব। সুতরাং উভয়েরই অস্ত্র যুক্তি।

আবার অনেক সময় যুক্তির বিকল্প হিসাবে বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বাস অনেক সময় মানসিক শক্তি। আমি যদি কঠোর পরিশ্রম করি তাহলে আমি বড় হবো—এটা একটা বিশ্বাস। কিন্তু যুক্তিতে এটা টেঁকে না। বহুলোক কঠোর পরিশ্রম করেছে, তারা বড় হতে পারনি। একজন শ্রমিক কম পরিশ্রম করে না। কিন্তু সে খুব বেশি দূর যেতে পারেনা। কিন্তু তা বলে বিশ্বাস ভেঙে দিলে যুক্তি দিয়ে

চুল চেরা বিচার করে কাজ করতে এগুলে, কেউ আর পরিশ্রম করবেনা। মানুষ চেনার আর একটি সহজ উপায় তার পেশা বা চাকরি। এখানে মানুষ চেনা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, একজনের ব্যক্তিত্ব, মানসিক গঠন। মনঃস্তত্ত্ববিদ স্প্যাঙ্গার বলছেন, বয়স্ক মানুষের জীবনধারাকে পরিবর্তন করে তার পেশা বা বৃত্তি। একজন ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি আর একজন চাষীর মনোবৃত্তি এক হতে পারেনা। চাষীর চাষবাস ছাড়া অন্যান্য অভিজ্ঞতা কম। তার যাতায়াত মেলামেশায় সুযোগও কম। কাজেই চাষীর জীবনে পরিবর্তন আসেনা, কারণ পরিবর্তন চাইতে গেলে সব সময় সেটা চেয়ে যেতে হবে।

চাষী সরল, কারণ তার কাজের ধারার মধ্যে জটিলতা নেই। তাকে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হয়না। আধুনিক সৃজনশীল চাষীর কথা স্বতন্ত্র। একর প্রতি ফসল বাড়াতে গেলে বুদ্ধি লাগে।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীর জীবনদর্শন হচ্ছে লাভ। এই লাভের ভাগ বাড়াতে বাড়াতে সে একটা এমন জায়গায় চলে যেতে পারে যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় নেই।

মুনাফা করতে বুদ্ধি লাগে বিশেষ করে সজাগ দ্রুতবুদ্ধি তো লাগেই। তারপর যে যেমন পেশায় যায় তার পেশা অনুসারে তার বুদ্ধিবৃত্তি হয় বাড়ে, নয়তো তার ব্যক্তিত্ব একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। অনেক সময় দেখা যায় একটি লোককে খুবই অকর্মণ্য ও সাধারণ বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু দায়িত্ব পেলে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

যেকোনও একটি সাধারণ মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারে বসিয়ে দিন। দেখবে তার ব্যক্তিত্ব খুলে গিয়েছে। একজন লোককে, রাস্তা দিয়ে অগণিত মানুষের মধ্যে হেঁটে গেলে অথবা ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে গেলে সে যদি বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিও হয় তাকে অতিসাধারণ মানুষ বলে মনে হয়। আবার ওই লোক যখন মহাকরণের সংরক্ষিত এলাকায় তাঁর ছোট্ট চেম্বারে বসেন, তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব অন্যরকম হয়ে যায়।

একদিন বাজারে মাছ কিনছি। মাছ পছন্দ না হওয়ায় চলে যাচ্ছি। মাছওয়ালা বলছে, আপনি চলে যাবেন না, এই দাদা আমার কাছ থেকে রোজ মাছ নেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। তাকিয়ে দেখি মাথা হেঁট করে মাছ বাছছেন, এক ভদ্রলোক। মাছওয়ালার সেই দাদা—তিনি আর কেউ নন, রাজ্য পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এক ডিজি। অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

॥ পনের ॥
বাবা মা কেমন শিক্ষা দিয়েছেন

কিছুদিন আগে আমাকে একটি প্রতিষ্ঠান তাঁদের বিজ্ঞান মেধা পুরস্কারের অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের একটি অংশ ছিল বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া। আমি এবং আর একজন অতিথি মিলে ভাগাভাগি করে ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দিলাম। দেখলাম কিছু ছেলেমেয়ে পুরস্কার নিতে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে গেল। আবার কিছু ছেলেমেয়ে হ্যান্ডশেক করে চলে গেল। এখন এই দুশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতেই তাদের তফাৎটা আমার চোখে পড়ল। যারা প্রণাম করল, তারা গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়ে, আর যারা হ্যান্ডশেক করল, তাদের চেহারায় স্মার্টনেসের ছাপ। তারা অধিকাংশই কলকাতার কাছাকাছি শহরতলীর স্কুলের ছেলেমেয়ে। এদের মধ্যে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের ছেলেমেয়েও আছে। আর এদের বেশভূষা ও চেহারা দেখে মনে হল একটু সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়ে তারা।

মূল্যবোধ বা ভ্যালুসিস্টেম দিয়ে অনেক সময় পরিবারের আর্থসামাজিক রূপের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের ও উচ্চবিত্তের বা মধ্যবিত্তের তুলনায় নিম্নমধ্যবিত্তের ভ্যালুসিস্টেম খুবই জোরদার। তারঅর্থ, তাদের মূল্যবোধ সহজে পালটায় না। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা আত্মবিশ্বাসে এতই ভরপুর থাকে যে তারা চটকরে কারও কাছে মাথা নত করেনা।

মানুষের ব্যবহারের মধ্যদিয়েই তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এক শ্রেণীর লোক আছে কথায় কথায় মুখ খিস্তি করছে। অশ্লীল শপথ বাক্য বলে কথা বলছে। কেউ সব সময় রেগে মেগে তেরিয়া হয়ে আছে। কেউ বা বহু প্ররোচনার মধ্যেও উত্তেজিত হচ্ছেনা। মনস্তাত্বিকরা বলেন, কে কেমন লোক তা ছোটবেলা থেকেই মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে যায়, ষোল শতকের মনস্তত্ত্ববিদ ইগনেটিয়াস বলতেন, ছবছর বয়সের আগে কাউকে যা শেখানো যায় সে আর কখনও ভোলেনা। ফ্রয়েডও বলতেন, কার শৈশবটা কেমন কাটল সেটাই তার পরবর্তীকালের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকা। ফ্রয়েডের কাছে অনেক রোগী আসতেন, যাঁরা ব্যক্তিত্বের নানা সংঘাতে ভুগছিলেন। ফ্রয়েড জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তাদের প্রত্যেকের শৈশব খুবই অসুখী ছিল।

তাই যদি কোনও প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের মধ্যে কোনও ব্যক্তিত্বের অসঙ্গতি দেখেন তাহলে বুঝবেন, এর শিকড় হয়ত লুকিয়ে আছে তার শৈশবে। ব্যক্তিত্বের অসঙ্গতি বলতে আমি মোটামুটিভাবে বোঝাতে চাইছি পরিবার ও সমাজের সকলের সঙ্গে মানিয়ে না চলতে পারা।

১. অনেকে দেখবেন অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। তারা স্বাধীনতা প্রিয়। তারা কারও কাছে মাথা নিচু করেনা। এদের সঙ্গে সহজেই অপরের ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাঁধে।

২. অনেকে মিনমিনে স্বভাবের। তারা সবাইর কাছে কাঁচুমাচু হয়ে থাকে। অপরকে খোশামোদ করতে তারা পটু। কোনও গালাগাল তারা গায়ে মাখেনা। তাদের আত্মমর্যাদাবোধও কম।

৩. অনেকে প্রচণ্ড ধূর্ত হয়। তারা মুখে বলে এক, ভেতরে ভেতরে করে আর এক। সবসময় তারা মতলব আঁটে। সামনে মুখ মিষ্টি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্রী।

৪. কেউ বিষণ্ণ প্রকৃতির। জগত সংসার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। কোনও সামাজিক মেলামেশায় অংশ নিতে চায়না।

৫. কেউ স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। অর্থ রোজগার এবং ভোগ ছাড়া আর কিছুই বোঝেনা। তাদের কাছে কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় সূক্ষ্মকলা অর্থহীন।

৬. কেউ উদ্ধত, বেপরোয়া, দুঃসাহসী, কেউবা দুর্বল ভীরু। দুই বিপরীত ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ করে দুর্বল ব্যক্তিত্বের লোকেদের পক্ষে অসৎ ব্যক্তিদের প্রলোভন জয় করা মুশকিল হয়। তাই তারা সঙ্গদোষে পড়ে অনেক খারাপ কাজ করে। আবার সেই একই লোক যখন ভাল মানুষের সঙ্গে মেশে তখন তার চরিত্রের কোনও বদগুণ প্রশ্রয় পায়না। আমি এমন অনেক ব্যক্তিত্ব দেখেছি। বাজারে দুশ্চরিত্র ও মদ্যপ বলে বদনাম এমন অনেকের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে মিশে দেখেছি তিনি আমার সঙ্গে পরম সাত্ত্বিকের মত আচরণ করেছেন। আবার আমার অসাক্ষাতেই তিনি কুসঙ্গে মিশে নানা কুকীর্তিতে লিপ্ত হয়েছেন। আমি সবই জানি। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। আগেকার দিনে অনেক শিক্ষিত পত্নীপরায়ণ ও ধার্মিক ব্যক্তিও মাসে নিয়ম করে রক্ষিতার কাছে যেতেন। অনেক নামী সম্ভ্রান্ত দেশ নেতারও রক্ষিতা ছিল। কোনও লোক দেখবেন সারাজীবন মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে—প্রতারণা করছে। অথচ খুব আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সুন্দর চেহারা, সুন্দর কথাবার্তা।

আমি একজনকে জানতাম, ঘোরতর সংসারী। ছেলেরা প্রত্যেকেই কৃতী। তিনিও ভারত সরকারে চাকরি করতেন। কিন্তু রাতে মদ খেয়ে এসে বউকে মারধোর করতেন। অথচ পরদিন তাঁকে দেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলে কারও মনে হবেনা, তিনি রাতে নরপশুতে পরিণত হন। তার আর একটা নিষ্ঠুরসত্ত্বা আছে। এমনি বহু শিক্ষিত মার্জিত সংস্কৃতিবান ব্যক্তি বাড়িতে স্ত্রীর কাছে অন্যরকম

ব্যবহার করেন। তাঁদের বউরা নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার। আবার বহু মহিলা বাইরে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, সুশিক্ষিতা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে চাকর বাকরের মত ব্যবহার করেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেননা।

ব্যক্তিত্বের এই যে স্ববিরোধিতা একমাত্র মনোবিশ্লেষণ ছাড়া ধরা সম্ভব নয়।

মনোবিশ্লেষণের আগে ব্যক্তির কুলপঞ্জী সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ তার পারিবারিক সংস্কৃতি কীরকম, পরিবারটি আলোকপ্রাপ্ত পরিবার না নানা ধরণের অন্ধকুসংস্কারে আচ্ছন্ন ? পরিবারে শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কোনও রেওয়াজ আছে কিনা, দেখবেন বাবা মা যদি সঙ্গীত শিল্পী হন বা তাঁদের মধ্যে যদি গানের চর্চা থাকে, তাহলে ছেলেমেয়েরাও ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বাবা মা-এর মধ্যে পাঠাভ্যাস থাকলে তা সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

আপনি একজন বয়স্ককে সাক্ষর করতে পারেন কিন্তু তাকে আর বুদ্ধিমান বা সংস্কৃতিবান করে তুলতে পারবেন না, যদিনা ছেলেবেলা থেকে তারমনে রুচিবোধ বেড়ে না ওঠে। বনেদী পরিবার বলতে আমরা বুঝি কয়েকটি প্রজন্ম ধরে যে পরিবার একটি পারিবারিক ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলে। পরিবারটি ভেঙে যায়না। তা শাখা প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লেও তার মূল প্রবাহ অব্যাহত থাকে। সাধারণত তিনচার প্রজন্মের পর একটি পরিবারের পারিবারিক ধারা লুপ্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ লোকই ঠাকুর্দার বাবার নাম বলতে পারেন না। বা তাঁর পরিচয় জানেন না। তাঁদের ফ্যামিলি ট্রি বা বংশধারার তালিকা খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত দেশবিভাগের জন্য ও কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের জন্য এখন পরিবারের মূল বৃত্ত থেকে অনেকেই ছিটকে পড়েছেন। এঁদের বলা হয় ছিন্ন মূল। এই ছিন্নমূলদের নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হয় অথবা সমসাময়িক মূল্যবোধ ও চিন্তাভাবনার দ্বারাই তাঁরা প্রভাবিত হন। কিন্তু এঁদের পূর্বপরিচয় আমরা জানিনা। বর্তমান পরিচয়টাই জানি। কিন্তু আমরা যেটুকু জানি, সেটুকু শুধু তাকে ওপর ওপর দেখে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে। কর্মজগতে এর চেয়ে বেশি জানার পরিচয় নেই। নিয়োগকর্তা শুধু জানবেন, যে কাজটি কর্মপ্রার্থীকে দেওয়া হবে, তিনি তার যোগ্য কিনা। কিন্তু বন্ধুত্ব করার বেলায়, জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপরিচয় জানাটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনোবিদ গেসেল এটআল বহু ছেলেমেয়ের উপর জেনেটিক সমীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রথম বারো বছরের পর ছেলেমেয়েদের আর খুব বেশি বদলানো যায়না। ছেলেবেলায় যারা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, অথবা বাবার ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পায়নি, যারা দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে তাদের মানসিক গঠন দেখবেন ওই প্রথম বারো বছরের অভিজ্ঞতা অনুসারে তৈরি হয়েছে। খুব দারিদ্র্যের মধ্যে যারা মানুষ হয় তারা কিছুটা কৃপণ স্বভাব পায়, কিছুটা মিতব্যয়ী হয়। কিছুটা লোভীও হতে পারে। তাদের মধ্যে হীনমন্যতা বড় হলেও দূর হয়না। আবার প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হলে পরিশ্রম

বিমুখ অলস, আয়েসী, বাস্তবজ্ঞান বর্জিত এবং ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং কারও মানসিক গঠন জানতে গেলে সে কোন স্কুলে ছেলেবেলায় পড়েছে, তাদের বাড়ির অবস্থা কেমন ছিল, বাবা মায়ের সম্পর্ক কীরকম ছিল এবং তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগগুলি সে ছেলেবেলায় পেয়েছে কিনা তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ছেলেবেলায় খেলাধূলার বিস্তৃত মাঠ, খেলার সুযোগ ও সময় ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্তির মানসিক বিকাশের সহায়ক হয়। ছেলেবেলার অপ্রীতিকর ঘটনা শিশুর পরবর্তী জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূর করা যায় একমাত্র সচেতন প্রয়াসের ফলে। অর্থাৎ আপনি যদি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন শৈশবের দুঃস্বপ্ন এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আপনার মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি মুছে ফেলবেন, তাহলেই সেট মুছে ফেলতে পারবেন। এজন্যই নিয়মিত মানসিক বিপর্যয় ঘটলে মনঃসমীক্ষকদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তবে ছেলেবেলাটা স্বাভাবিক ভাবে কাটলে সুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তার ফলে পরবর্তীকালে যে কোন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে। যার ছেলেবেলা খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটেছে এবং যার সমস্ত ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ ঘটেছে, সে কর্মজীবনে এসে নানা মানসিক সমস্যায় পড়লেও তার মানসিক শক্তির জোরে সেই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

আমরা আগেই বলেছি সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হলে ব্যক্তিত্বেরও পরিবর্তন হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

আগের মূল্যবোধ অনুসারে বাঙালি মেয়েদের শাড়ি পরাটাই ছিল রেওয়াজ। কিশোরী মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরত। পরবর্তীকালে কিশোরীরাও ফ্রক পরতে লাগল। কিন্তু কলেজের মেয়েরা শাড়ি পরত। এখন কলেজের মেয়েরাও ফ্রক, স্কার্ট, শালোয়ার কামিজ পরছে। শাড়ি পরা মেয়ের সংখ্যা কলেজে কমছে। কারণ মূল্যবোধ বদলাচ্ছে। নতুন মূল্যাবোধের ফলে নতুন ব্যক্তিত্বের জন্ম হচ্ছে। মূল্যবোধ আসে সংস্কৃতি থেকে, সংস্কৃতির যুগে যুগে রূপান্তর হয়। পোশাক পরিচ্ছদ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। এখন গণসংস্কৃতির যুগে সংস্কৃতি কেমন হবে তা ঠিক করে দেয় বাণিজ্যিক কর্পোরেশন ও গণমাধ্যম। তারাই সুকৌশলে ফ্যাড ও ফ্যাশন নানা প্যাকেটে মুড়ে বাজারে ছাড়ে। ধুয়ো তোলে আধুনিকতার। জনগণও তাই অম্লান বদনে বিশ্বাস করে। আগামী পাঁচবছরের মধ্যে সমস্ত শিক্ষিতা বিবাহিতা অবিবাহিতা তরুণীরা সকলেই শালোয়ার কামিজ পরবেন। এটাই হবে মেয়েদের সর্বভারতীয় পোশাক। এটি হবে পোশাক নির্মাতাদেরই ইচ্ছায়। মূল্যবোধও এইভাবে তৈরি হয়ে যাবে। তখন আর শালোয়ারকে কেউ অশালীন বলবেন না। ল্যাটিন আমেরিকায় মেয়েরা শর্ট আর ব্রাহীন ব্লাউজ পরে কাজকর্ম

করছে—কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, কারণ তাদের মূল্যবোধই এভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বও বদলায়। কিন্তু সমস্ত কিছু সত্ত্বেও বাবা-মা ছেলেমেয়েদের কীভাবে মানুষ করেছে তার উপর ছেলেমেয়েদের চরিত্র অনেকখানি নির্ভর করে। বাবা মায়ের প্রভাব চেতনভাবে বা অবচেতনভাবে ছেলেমেয়েদের ওপর এসে পড়বেই। আগে ধারণা ছিল, বাবা মা কিছু নয়, ছেলেমেয়েরা নিরপেক্ষভাবেই তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে। কিন্তু পেক এবং হ্যাভিগহার্স্ট নামে দুজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করে বার করেছেন। প্রত্যেক কিশোরকে দেখে বলে দেওয়া যায় সে কেমন ছেলে, যদি তার বাবা মা তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে আসছে তা জানা যায়।

বাবার শাসন : আগে ও এখন

বাড়িতে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা মায়েদের। তারপর বাবার। স্কুলে শিক্ষকের ভূমিকাও শিশুর চরিত্র গঠনে ভীষণভাবে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে স্কুলের সহপাঠীদের ভূমিকাও জীবনে অপরিসীম। এই যে মানুষের মধ্যে নানা সংস্কার ও ধারণার সৃষ্টি হয়, সেই ধারণা ও সংস্কারগুলি সে যাদের সঙ্গে মেশে যদি তাদের সমর্থন পায় তাহলে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাহলে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে মানুষটি কেমন তা জানতে গেলে তার বংশ পরিচয়, পিতৃপরিচয়, পারিবারিক সংস্কৃতি অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষা রুচি, সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের ব্যাপারে পরিবারের আগ্রহ তার আর্থিক শ্রেণী যেমন জানতে হবে তেমনি জানতে হবে তার বাল্যকালের কথা। কারণ বারো বছর পর্যন্ত একজন কীভাবে কাটিয়েছে তা জনতে পারলেই তার মানসিক প্রবণতা অনেকখানি বলে দেওয়া যায়। আমাদের দেশে এখনও শ্বশুরবাড়িতে এসে বউ যদি এমনকিছু কাজ করে বসে

যা শ্বশুর শাশুড়ির মনঃপূত নয় তাহলে দজ্জাল শাশুড়ি তাকে কথা শোনোয়—ছেলেবেলায় মা বাবা কি তোমায় কিছুই শেখায় নি গা ? অথবা বলে, হবে নাই বা কেন, হাঘরের বাড়ি থেকে মেয়ে নিয়ে বউ করেছি তাই এই ফল পাচ্ছি।

অনেক ঠোঁট কাটা বউও আছে। বিয়ের তে রাত পোহাতে না পোহাতে চোপা করতে শুরু করে। স্বামীর কান ভাঙিয়ে শ্বশুর শাশুড়িকে বাড়ি থেকে তাড়াবার চেষ্টা করে। বউএর জ্বালায় অস্থির হয়ে বিপত্নীক শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে ছোট বাসা ভাড়া করে আছে—এমন ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি।

কেউ জেদি বা একরোখা হয়। কেউ গোঁয়ার গোবিন্দ হয়। কেউ বা স্বেচ্ছাচারি হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের মধ্যে জেদ একটু বেশি থাকে। জেদ হল একধরণের নিরুচ্চার প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ অথবা আত্মপীড়ন। পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা সবসময় সোচ্চারে প্রতিবাদ জানাতে পারেনা, তাই আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে তারা প্রতিবাদ জানায়। ধরুন, আপনার স্ত্রী সংসারের বিরুদ্ধে রেগে রয়েছেন। তিনি শীতকালে ঠাণ্ডার মধ্যেও কোনোও শীতবস্ত্র ব্যবহার করবেন না। আপনি বহুবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরও জেদ। অথবা পুজোয় তিনি নতুন শাড়ি পরবেন না। আপনি হাজার অনুরোধ করেও পরাতে পারলেন না।

ছেলেদের মধ্যেও জেদ আছে। তবে জেদের বহিঃপ্রকাশ অন্যভাবে হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া এইসব জেদের মধ্যে একটি। জেদীদের শাসন করলে তারা শাসন মানা দূরে থাক উলটে সেই কাজটাই বেশি করে করে।

আগেই বলেছি প্রতিটি মানুষের মানসিক গঠন কীরকম হবে তা নির্ভর করে সে কীভাবে মানুষ হয়েছে তার ওপর।

যেমন গল্পে আছে রাজার ছেলে জানেনা কীভাবে নমস্কার করতে হয়। সেতো কাউকে কখনও মাথা হেঁট করে নমস্কার করেনি।

ছেলেবেলায় যারা বাবামায়ের আদরে মানুষ হয়, যাদের বাবা বাজার করে দেয়, মা জুতোর ফিতে বেঁধে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, একটা বয়স পর্যন্ত খাইয়ে দেয়, বেশি বয়স পর্যন্ত একা একা কোথাও ছাড়েনা, তারা বড় হয়েও চিরখোকা থেকে যায়। অবিবাহিত অবস্থায় তারা মায়ের খোকা হয়ে থাকে, বিয়ে হলে তারা বউ-এর 'খোকা' হয়ে থাকে। তাদের বউরাই চটপটে, পরিশ্রমী ও উদ্যোগী হয়। স্বামী কুঁড়েমি করে আর সন্তান উৎপাদনের অন্যতম অংশীদার হয়েই সারাজীবন তোফা আরামে কাটিয়ে দেয়।

এখানে দজ্জাল শাশুড়ির বিদ্রূপবাণীটি মনে পড়ে। বৌমা, তোমার বাবা মা কি কিছুই শেখায় নি গা ?

কথাটা সত্যি, বাবা মায়ের শেখানোর উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

অনেকখানি নির্ভর করে। হেরিডিটি বা পরম্পরার উপর যতখানি নির্ভর করে ঠিক ততটাই নির্ভর করে শৈশবের পরিবেশের উপর।

বুড়ো খোকাদের কাজকর্ম দেখে অনেকখানি বলে দেওয়া যায় যে তাদের ছেলেবেলায় বাবা মায়ের শাসন কীরকম ছিল।

তিনধরণের বাবা-মা আছেন। এক নং স্বৈরতন্ত্রী, দুনং গণতন্ত্রী ৩নং যথেচ্ছপন্থী।

প্রথম নম্বর অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রী বাবামায়ের বিশেষ করে বাবারা বিশ্বাস করেন, ছেলেমেয়েদের না মেরে যদি বেত তুলে রাখেন তাহলে বেতটি নষ্ট হবেনা, কিন্তু ছেলেমেয়েরা নষ্ট হবে।

এইজন্য ওঁদের জীবনদর্শন হচ্ছে বেধড়ক মারো। একটু বেআদপি করলে লাঠির বাড়ি কষাও। আমার বাবার লাঠি ছিল ছেলেবেলায় আমাকে মারার জন্য। আমাকে একবার ছেলেবেলায় কুকুরে কামড়েছিল। আমি তখন গ্রামে মামার বাড়িতে। কুকুরটি কামড়ে পায়ে রক্ত বার করে দিয়েছিল। সেই রক্তাক্ত পা নিয়ে কাদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকেছি। দাদামশাই সামনে ছিলেন। আমাকে সেই অবস্থায় দেখে কি করলেন বলুনতো ? ভাবছেন সঙ্গে সঙ্গে কোলে করে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটলেন ? মোটেই তা নয়। আমাকে দাওয়ার খুঁটিতে বেঁধে প্রথমে একটা কাঠ দিয়ে আচ্ছা করে আমাকে মেরে নিলেন। তারপর আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। স্বৈরতন্ত্রী বাবার ছেলেমেয়েরা শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়। আগে এক একটি পরিবারে তিনচার ভাই থাকত। সকলেই খুব কৃতী হত। খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের জীবনে খুব কঠোর শৃঙ্খলা ছিল।

আমার পিসেমশাইর বাড়িতে দেখেছি, তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জেলা জজ। তাঁর নীতি ছিল সরল জীবনযাত্রা। ছেলেমেয়েরা সবাই ছোট ছোট চুল ছাটত। বাড়িতে নাপিত আসত। সাধারণ জামাকাপড় পরত। তারা প্রত্যেকে সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফিরত। সিনেমায় যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ছেলেবেলায় এই বিধি নিষেধ শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে ছেলেরা বড় হয়েও কেউ বিবাগী হয়ে ওঠেনি। গণতন্ত্রী বাবা মায়েরা ছেলেমেয়েদের খুব বেশি কড়াকড়িও করেন না, আবার তাদের চোখে চোখে রাখেন। তাঁরা ছেলেমেয়েদের একা সিনেমায় ছাড়েননা—নিজেরা সঙ্গে করে নিয়ে যান। তাঁরা চান ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হোক—কিন্তু ভরসা করতে পারেন না। তাঁরা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন। ছেলেমেয়েদের সাজেশন শোনেন। তবে শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগটাই নিজেদের মত অনুসারে ছেলেমেয়েদের চালান।

তাঁরাও ছেলেমেয়েদের মারধর করেন—কিন্তু আটদশ বছর বয়স হয়ে গেলে আর গায়ে হাত তোলেন না।

স্বৈরতন্ত্রীরা ছেলেমেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেন নিজেরাই। ছেলেমেয়েদের মতামত নেন না। শুধু জানান, তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছি। পাত্রী আমাদের পছন্দ। যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে বলতে পারো। নয়তো আমরা মেয়ের বাবাকে এক রকম কথা দিয়ে দিয়েছি—এ বিয়ে হবেই।

কিন্তু গণতন্ত্রী বাবা মায়েরা নিজেরা ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ নেন বটে। কিন্তু পাত্রী বা পাত্র দেখার সময় বলে আসেন ছেলেমেয়ে যা বলবে সেটাই ফাইন্যাল। বিয়ের ব্যাপারে তাঁদের ইচ্ছাকে তাঁরা রূপায়িত করলে কিন্তু সহায়তা নেন ছেলেমেয়েদের। স্বৈরাচারী বা যথেচ্ছচারীরা ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে আর তার খোঁজ রাখেন না। ছেলেমেয়েরা তখন কী করছে সেটা দেখা তাঁরা খারাপ চোখে দেখেন।

তাদের ছেলেমেয়েরা বিয়ের পর আলাদা হয়ে যায়। তাদের ছেলেমেয়েরা পছন্দমত পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেন। এইসব পরিবারে পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নেই। ভাই বোনদের মূল্যবোধ আলাদা আলাদা হয়। কেউ কারও খোঁজ খবর রাখেনা।

যথেচ্ছচারীদের জীবনপঞ্জী ঘাঁটলে দেখা যাবে হয় তাদের পারিবারিক বন্ধন খুব শিথিল। অনেকের ছেলেবেলায় বাবা কিংবা মা মারা গিয়েছেন। অথবা বাবা মা ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে উদাসীন। তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তবে যথেচ্ছাচারি পরিবারে ছেলেমেয়েদের একটা সুবিধে আছে। তারা ছেলেবেলা থেকে আত্মনির্ভরতা শেখে। তারা অল্প বয়সে পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এর ফলে কেউ তাদের ঠকাতে পারেনা। তারা বড় হয়ে চালাক চতুর হয়ে ওঠে। তারা তাদের পছন্দমত জীবনকে চালনা করতে পারে। বহু ছেলে কিশোর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব পরিবারের অনেক ছেলে একসময় নকশাল হয়ে যায়। আবার তাদের মধ্যে যারা চালাক চতুর তারা সেসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভাল ভাল চাকরি বাকরি নিয়েছে। ব্যবসা করে ভাগ্য ঘুরিয়েছে। এমনকি কেউ কেউ সিনেমার হিরো পর্যন্ত হয়েছে। শিশুর প্রতি বাবা মায়ের মনোভাব তথা শিশু মানুষ করার ধরণ ধারণ একজনের সমগ্র জীবনধারা তৈরি করে দেয়।

দেখা যায় ধনীও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা মায়েরা স্বৈরতন্ত্রী হয়ে ওঠে। কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ছেলেদের মানুষ করার চেষ্টা করে। উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ছোট পরিবারের বাবা মায়েদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারণা গড়ে উঠছে। নিম্নবিত্ত ও গরিব পরিবারেই বাবা মায়েরা উদাসীন বা যথেচ্ছচারী।

ছেলেবেলা থেকে যে সব ছেলেমেয়ের ব্যক্তিত্বকে তার বাবা মা বিকশিত হতে দেননা তারা বড় হয়ে খুবই কাঁচুমাচু হয়ে থাকে। নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা। প্রতিবাদ করতে পারেনা, নীরবে সব কিছু হজম করে।

ছেলেবেলায় সে যা মন থেকে মেনে নিতে পারেনা বাবামায়ের ভয়ে সে সে কাজটা করতে বাধ্য হয়। এর ফলে আচরণে অবাধ্য না হলেও সে মনের দিক থেকে বিদ্রোহী হয়ে থাকে। ভেতরে ভেতরে বাবা-মাকে ঘৃণা করতে শেখে। পরবর্তী জীবনে সে গুজগুজে স্বভাবের এক ষড়যন্ত্রী মানুষে পরিণত হয়। আবার স্বেচ্ছাচারি হয়ে মানুষ হয়েছে যে ছেলেমেয়ে সে বড় হয়ে কোনও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনা।

ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে একটি মেয়ে যা খুশি তাই করে এসেছে। বাড়িতে তার কোনও শাসন বা নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। সে যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। যখন খুশি বাড়ি ফিরেছে। যার সঙ্গে খুশি মিশেছে। তার টাকা পয়সার অভাব নেই। উগ্র সাজগোজ করেছে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ির শৃঙ্খলার মধ্যে সে মানিয়ে নেবে কীভাবে ? যে স্বাধীনতায় অভ্যস্ত সে স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইবে কেন ?

॥ ষোল ॥
জনপ্রিয়তার অন্তরালে আসল মানুষ খুঁজুন

যদুবাবু একজন সেলসম্যান। একটি কম্পানিতে মাল বিক্রির সময় তাঁর সঙ্গে কম্পানির ম্যানেজার রামবাবুর আলাপ হয়। দেখা যায়, রামবাবুর কল্যাণে যদুবাবু অল্প সময়ের ভেতর প্রচুর মাল বিক্রি করে বিশেষ কৃতী হলেন।

একদিন রামবাবু ক্ষমতাচ্যুত হলেন। রামবাবুর জায়গায় এলেন শ্যামবাবু। যদুবাবুর ধারণা হল এতে তাঁর আরও ভাল হবে। কারণ শ্যামবাবুকে তিনি আরও আগে থেকে চিনতেন। তিনি রামবাবুকে ছেড়ে শ্যামবাবুকে খাতির করতে শুরু করলেন। তাকে নানা গিফট পাঠাতে শুরু করলেন। কিন্তু শ্যামবাবু যদুবাবুর কোনও উপকার করলেন না। বরং রামবাবুর আমলের অর্ডার ছাটাই করে দিলেন। অথচ শ্যামবাবু মুখে যদুবাবুকে আশ্বাস দিয়ে আসছিলেন যে তাঁর অর্ডার যেমন আছে তেমন থাকবে।

অন্যদিকে রামবাবু ক্ষমতাচ্যুত হয়েও যখন দেখলেন যদুবাবুর জন্য তিনি তাঁর নিজের কম্পানিতে কিছু করতে পারছেন না, তখন তিনি তাঁর পরিচিত অন্য কম্পানিতে যদুবাবুর মাল বিক্রি করে দিলেন। এখানে যদুবাবু শ্যামবাবুকে ঠিক চিনতে পারেননি। ভেবেছিলেন, তিনি এতদিন ধরে শ্যামবাবুকে টুকটাক বহু জিনিস উপহার দিয়ে এসেছেন, শ্যামবাবুর শালীর বিয়ের সময় উপযাচক হয়ে দুদিন গাড়ি দিয়েছিলেন, এসব কারণে যদুবাবু খুব আশা করেছিলেন শ্যামবাবু তাকে বেশি করে অর্ডার দেবেন। এখন রামবাবু ও শ্যামবাবু দুজনের মধ্যে

শ্যামবাবুরা মানুষের কোনও উপকার করেন না। অন্যের উপকার নিয়ে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের জনপ্রিয়তা কমেনা।

কেন কমেনা ? তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে শ্যামবাবুর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হবে।

শ্যামবাবু খুব ভাল গল্প করতে পারেন। আসর জমাতে পারেন। মেয়ে মহলে তাঁর দারুণ খাতির। কারণ মেয়েরা অগভীর অথচ ঝকমকে ব্যক্তিত্বকে পছন্দ করে। হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, নানা মজাদার গল্প বলে যে পুরুষ আসর জমাতে পারে মেয়ে ও পুরুষ মহলে তারা খাতির পায়। তাছাড়া রামবাবু মিষ্টি কথা বলতে পারেন। তাঁর কথা বলার ধরণের মধ্যেও বেশ নাটকীয়তা আছে, যেমন তিনি প্রতিটি শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করেন। স্বরক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ গলার ভয়েস মডুলেশন করতে জানেন। এছাড়া তিনি কখনই কাউকে মুখের ওপর না বলেন না। দেখছি দেখব বলে ঝুলিয়ে রেখে দেন। তারপর একদিন মিষ্টিকরে বলেন, ও আপনার কেসটা এখনও হয়নি। আমাকে তো এম ডি বলেছিলেন হয়ে যাবে। তাহলে হয়তো ভেতর থেকে কেউ বাগড়া দিয়েছে। আসলে তিনি কেসটি কাউকে বলেননি।

অন্যদিকে রামবাবু খুবই পরোপকারি। তিনি কাউকে কথা দিলে কথা রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি গম্ভীর প্রকৃতির। যেটি করা যাবেনা মুখের ওপর বলে ভাই এটা আমি পারব না। আমার ক্ষমতা নেই। তিনি জমিয়ে গল্প করতে পারেন না। তাঁর কাছে হাল্কা কথাবার্তা খুবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

তিনি লাজুক প্রকৃতির। একটু অন্তর্মুখী। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা পান। বিশেষ করে অন্যের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি পটু নন।

এজন্য লোকে তাঁর কাছে কাজ গুছনোর জন্য আসে। কাজটা গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। আবার যখন দরকার পড়ে তখন আসে। কারণ আড্ডাবাজ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, সমমনস্ক ব্যক্তি হিসাবে সাধারণ মানুষ তাঁকে তাদের সঙ্গে নিরন্তর মেশার উপযুক্ত মনে করে না।

কিন্তু কোনও মানুষ সামাজিক ভাবে জনপ্রিয় নন মানে তিনি বাজে লোক আর সামাজিকভাবে জনপ্রিয় ব্যক্তিরা সকলেই ভাল লোক একথা মনে করার কোনও কারণ সমস্তগুণ মিলিয়ে একজন সামাজিকভাবে জনপ্রিয় হন, অথবা জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় গুণগুলি (যেমন চেহারা, ভাল গানের গলা, ক্লাশে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, হাত দেখতে জানা, মজলিশি স্বভাবের লোক হওয়া, লোককে সহজে হাসাতে পারা ইত্যাদি)। কিন্তু যেসব গুণগুলি লোকে দেখতে পাননা একজনের যদি শুধু সেইসব গুণ থাকে (যেমন মানবিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল, সত্যনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, সততা, নৈতিক মূল্যবোধ) তাহলে লোকে তার কোনও গুরুত্ব দেন না।

একারণে আমি দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক খলনায়ক বাইরের জীবনে

একজন মেধাবী কৃতী পণ্ডিত ও উচ্চপদের অফিসার লোকে বলে দেখেছ কী বিরাট পণ্ডিত লোক। কী বিরাট চাকরি করছেন।' উনি আমাদের বাঙালির গর্ব।

বাঙালির ওই গর্ব হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে বহু মহিলার সর্বনাশ করেছেন। নিকটতম বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে লোকে ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিকতার প্রশ্ন তোলেনা।

বিশেষ করে চলচ্চিত্র নায়কদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় দুর্নীতি তাদের জনপ্রিয়তাকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করেনা। মাইকেল জ্যাকসনের বিকৃত জীবন যা যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই ঘৃণ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে তা মাইকেল জ্যাকসনের জনপ্রিয়তাকে কিন্তু কমায়নি। তিনি আজও যদি পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ান আবার হাজার হাজার মানুষ তাঁর জয়গান গাইবে। জনপ্রিয় ম্যাটিনি আইডলেরা তাঁদের স্ত্রীদের পরিত্যাগ করে অন্য মহিলাদের সঙ্গে সহবাস করেন। আবার আইন ভেঙে দুবার বিয়েও করেন অনেকে। কিন্তু তবু তাঁদের পুজো করে ভক্তরা। কেউ ভাবেনা তাঁদের পরিত্যক্ত স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মর্মবেদনার কথা।

তবে এগুলি প্রযোজ্য একমাত্র প্রতিভাধর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। প্রতিভাধর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিভাই জনপ্রিয়তা বা সামাজিক স্বীকৃতির মাপকাঠি। আমাদের ছেলেবেলায় স্কুলে আমার এক সহপাঠী ছিল। তার নাম দুর্গা। দুর্গা ক্লাশে ফার্স্ট হত। খুব ভাল কথা বলত। নেতৃত্বসুলভ যাবতীয় গুণ ছিল তার মধ্যে। স্কুলের মাস্টারমশাই, সহপাঠী থেকে শুরু করে পাড়ার লোকদের মধ্যে দুর্গা ছিল খুবই জনপ্রিয়। আমার বাবা মা বলত দুর্গার মত হও।

কিন্তু দুর্গার ব্যক্তিগত চরিত্র খুব খারাপ ছিল। সে স্কুলে ক্লাশ এইটে পড়ার সময় সিগারেট খেত আর একাধিক মেয়ের সঙ্গে ওই বয়সেই সে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। স্কুলফাইন্যাল পড়ার সময় তার চেয়ে বয়সে বড় এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক হল। একটি বাচ্চা শুদ্ধ সে ১৯/২০ বছর বয়সে ওই মহিলাকে বিবাহ করে। তখন মহিলার বয়স অন্তত ২৫। আই এস সি পড়ে আর তার পড়াশুনো হয় না। সে চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যায়। পরবর্তীকালে মদখেয়ে শরীর নষ্ট করে ফেলে। অল্পবয়সে তার মৃত্যু হয়।

কিন্তু ছাত্রজীবনে দুর্গা যতদিন প্রতিভাবান ছিল অর্থাৎ ক্লাশে ফার্স্ট হত সে সময় তার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্গা যখন কর্মজীবনে সফল হতে পারল না, তখন লোকে তার দোষ ত্রুটি ও চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠল। সে আর আগের মত জনপ্রিয় থাকল না।

সাধারণ মানুষকে তাই দৈনন্দিন জীবনে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় কারণ তার সামান্য ত্রুটি ও চারিত্রিক শ্লথতা অতি দ্রুত সমালোচনার কারণ হয়ে উঠবে। একের পক্ষে যা গুণ অন্যের পক্ষে তা দোষ।

আগেকার দিনে বড় বড় রাজারা যখন গায়ের জোরে সাম্রাজ্য দখল করতেন তখন তাঁদের রাজচক্রবর্তী বা দিগ্বিজয়ী উপাধিতে ভূষিত করা হত। কিন্তু কোনও দরিদ্র পূজারি ব্রাহ্মণ যদি পুজো করে যজমানের বাড়ি থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে সামান্য চাল কলা নিয়ে আসত, তাহলে সবাই তাকে উপহাস করত চাল কলা বাঁধা পুরুত বলে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধের পিণ্ডি খায় বলে ব্রাহ্মণ সমাজ তাকে একঘরে করে রাখে। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি—এটি জেনেও রাজাকে কেউ চোর বলেনা। রাজা, রাজা। কিন্তু পেশাদার চোরেরা সব সময় গরিব। চুরির অভিযোগে যারা জেল খাটে তাদের খাওয়া জোটেনা। আর যে সব চোরেরা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার চুরি করে, স্যুটকেশে করে যাদের বাড়ি বয়ে লোকে টাকা দিয়ে আসে, তারা কিন্তু জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ চূড়ায় থেকেই যায়। কারণ জনপ্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় টাকা দিয়ে। টাকা দিয়ে এমন পজিশনে উঠে যাওয়া যায় যেখানে চুরির দায়ে ধরা পড়লেও, সুকৌশলে তার লোকেরা প্রচার করে ষড়যন্ত্র করে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভালমানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যে হয়না তা নয়। পুলিশ বহু নির্দোষকেও ধরে। কিন্তু এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির ফলে আসল নকল চেনা সত্যিই মুশকিল।

কে ভাল কে মন্দ, কে সাধু কে শয়তান আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝা দুরূহ। বাজারে এখন সব কিছুরই দুনং পাওয়া যায়। একই রকম দেখতে। আপনার পক্ষে চেনা খুব মুশকিল।

আমি যখন বাড়ি করছিলাম তখন আমি একটি নামী কম্পানির ইলেকট্রিক তার কিনে আনলাম। কিন্তু আমার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি দেখে বলল, বাবু এ দুনম্বরি মাল। আমি অবাক। একই রকমের সিল, প্যাকিং। দোকানে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরতেই তারা কবুল করে আসল মাল দিল। মানুষ চেনা আরও কঠিন। কারণ মানুষ অতি সহজেই বহুরূপী হতে পারে। মায়ায় ভোলাতে পারে। অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলতে পারে। যে যত বড় চোর সে তত বেশি করে ধর্মের কথা, নীতির কথা শোনায়, তারা তত বেশি করে গুরুর চেলা হয়, একজন অনাথ আশ্রম চালাচ্ছেন বলে মনে করার কারণ নেই, তিনি অনাথদের ভালবাসেন। একজন শ্রমিকদের দাবিতে কেঁদে ভাসাচ্ছেন বলে মনে করার কারণ নেই তিনি নিপীড়িত শ্রেণীকে ভালবাসেন। তিনি বাড়ি ফিরেই তাঁর বাড়ির ঝি-চাকর ও অফিসে অধঃস্তনদের উপর হম্বিতম্বি করেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও কাগজ লিখছে বলেই মনে করার কারণ নেই ওই সাংবাদিক মিঃ ক্লিন। এ সমস্তই অভিনয়। অভিনেতা সবসময় দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর লোভ হাততালির উপর। একটি লোককে সম্পূর্ণ মানুষ হতে গেলে তাকে অনেক সময় কঠোর হতে হয় ও অনমনীয় হতে হয়। এর ফলে তিনি জনপ্রিয়তা হারাতে পারেন। আবার তাকে অনেক সময় অত্যধিক নমনীয় হয়ে সমঝোতা করতে হয় এজন্য তিনি কট্টরদের কাছে ধিকৃত হতে পারেন।

আত্মমর্যাদাবোধে অটল থাকতে হলে কাউকে সারাজীবন কিছু না পেয়ে বঞ্চিত হয়ে কাটিয়ে দিতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পারেন। গুরুত্বহীন বলে গণ্য হতে পারেন। কিন্তু যা আপনার কাছে প্রয়োজনীয় নয় তাকি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর ? সমুদ্রের জল লবণাক্ত। মানুষের পানের অযোগ্য। তা বলেকি, সমুদ্র শোষণ করে জায়গাটিকে ডাঙ্গা করে দিলেই তা প্রয়োজন সাধন করবে ?

তেমনি কোনও সমাজে কোনও মানুষ যদি সমসাময়িক সমাজ বা গোষ্ঠীদ্বারা সমাদৃত না হন, তাহলে তিনি একা পড়ে যাবেন। কিন্তু তিনি যদি একাই তাঁর চিন্তা ও বিশ্বাস অনুসারে কাজ করে যান তাহলে একদিন তাঁর কাজ আদৃত হবেই। কার্লমার্ক্স যখন তাঁর তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছিলেন, তখন তাঁর পিছনে বড় ইনস্টিটিউশন ছিলনা। যীশুর জীবদ্দশায় কোনও খ্রীষ্ট সংঘ তৈরি হয়নি। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেনি। বহু শিল্পীর জীবদ্দশায় তাঁদের ছবি বিক্রি হয়নি। মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ টাকায় সে সব ছবি বিক্রি হচ্ছে। সুতরাং আপাত জনপ্রিয়তা দিয়ে মানুষকে বিচার করা উচিত নয়। কোনও মানুষকে চট করে জানতে হলে তার বাড়ির কাজের লোক, স্বামী বা স্ত্রী, পাড়া প্রতিবেশী এদের কাছ থেকে জানতে হবে। তবে সব চেয়ে ভাল উপায় হল তার সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশা করে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকেও পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। আপনি একজন সাধারণ মানুষকে নিজে পরীক্ষা করে নেবেন না কেন ?

এবার বলি কয়েক ধরনের মানুষের কথা

খিটখিটে মানুষ ঃ পথে ঘাটে ট্রামে বাসে আপনি নিশ্চয়ই এমন অনেক লোক দেখেছেন যারা পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করে। আমি সাধারণত বেশি কথাবার্তা বলিনা কারণ বিশ্বাস করি, বেশি কথা বলা মানেই কিছু আবোল তাবোল কথা বলা। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। আমি তাই গায়ে পড়ে লোকের কথার মধ্যে নাক গলাতে যাইনা। যদি দেখি কোনও ঝগড়াটে লোক প্ররোচনামূলক কিছু কথা বলছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যাই। কারণ তাদের কথা সিরিয়াসলি নিলে আমারই টেনসন বাড়বে। হজমের গোলমাল দেখা দেবে। টেনসন রিলিজের জন্য সব সময় তারা একটি শিকার খুঁজে বেড়ায়।

কিছুলোক খিটখিটে বদমেজাজি ও মারমুখী হয়ে থাকে কেন ? কেনই বা কিছু লোক গম্ভীর ও নির্লিপ্ত হয়ে থাকে। আবার কিছু লোক সব সময় ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং রঙ্গ রসিকতা করে।

কোন কোন মানসিক অবস্থা থেকে এই মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয় ? এখানে একটা কথা বলা দরকার। মানুষের অভিব্যক্তি ও আচরণ থেকেই ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়না ব্যক্তিত্ব থেকেই অভিব্যক্তি ও আচরণের জন্ম হয় ? সাধারণ মানুষ বলবেন, আচরণ দিয়েই মানুষ চেনা যায়, যিনি খিটখিটে বদমেজাজী তাঁর আচরণ দিয়েই আমরা বুঝতে পারি—ভদ্রলোকের মানসিকতার মধ্যে ভারসাম্যের অভাব আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে এই ধারণা সত্য নয়। ব্যক্তিত্ব থেকেই আচরণের জন্ম। আচরণ দিয়ে ব্যক্তিত্বকে যাচাই করা যায় মাত্র। ব্যবহারের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি লোকটি ভদ্রলোক না ছোটলোক। লেখাপড়া, জাতপাত টাকা পয়সা দিয়ে ভদ্রলোক ইতর যাচাই করা যায়না। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে দেওয়ালের ড্যাম্প বা লোণার মত। যতই চূণকাম করুন, রঙ লাগান, ভেতরের ড্যাম্প ফুটে উঠবেই। ব্যক্তিত্ব কীভাবে তৈরি হয় আগেই বলেছি। আবার দুচার কথায় বলছি। ব্যক্তিত্বের পঞ্চাশ শতাংশই মানুষ পায় তার অবচেতন মনে। বাকি চল্লিশ শতাংশ সে নিজে সচেতনভাবে অর্জন করে। ধরুন একজন অহংকারি লোক। তার পঞ্চাশভাগ ব্যক্তিত্ব ছেলেবেলাতেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। তার হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিক জিন তার দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করেছে। তেমনি ভূমিকা পালন করেছে তার পারিবারিক পরিবেশ। তার বাবা মায়ের প্রভাব। এর উপর পড়েছে স্কুল ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। এই সব কিছু মিলে মিশেই তার অবচেতন মনে একটা ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। তারপর সে যখন বুঝতে শেখে তখন সমাজ ও পরিবেশ থেকে সে নানা শিক্ষা গ্রহণ করে তার ব্যক্তিত্বকে রূপান্তরিত করে, এটি যেন সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের কাঠামোর উপর মাটি লাগানো। এই পর্যায়ে সে অনুকরণ করে অথবা নিজেকে পরিবেশের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করে। অথবা নিজেকে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির উপর ছেড়ে দেয়।

ধরুণ, একজন এমন পরিবারে জন্মেছে যেখানে ছেলেবেলা থেকে পরিবারের লোকেরা পরস্পরকে ঈর্ষা করে। বাড়িতে দিনরাত ঝগড়া হয়। সে ছেলের অবচেতন মনে ঈর্ষা ঘৃণা হীনমন্যতা ছেলেবেলা থেকেই গেঁথে যাবে। এখন বড় হয়ে সচেতন মন দিয়ে সে যদি বোঝে ঈর্ষা ঘৃণাকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে জীবনে শান্তি পাওয়া যাবেনা, তাহলে সে তা কাটিয়ে উঠতে পারে। আবার একজন শৈশবে খুব প্রাচুর্য সুখ ও শান্তির মধ্যদিয়ে মানুষ হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কর্মজগতে প্রবেশ করেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে খুব প্রসন্নচিত্ত ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিল। তারপর কর্মজীবনে ঢুকে সে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হল। মনুষ্য প্রকৃতিই হল, ক্ষমতা মানুষকে অহংকারি করে তোলে। ক্ষমতাবান ব্যক্তি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। সে তখন আরও দ্রুত আরও ওপরে উঠতে চায়। যেহেতু সে প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয় সে নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে। অপরকে পীড়ন করে

তার আত্মরতি হয়। এইভাবে সে নিজে জালে নিজে জড়িয়ে পড়ে, আপন প্রকৃতির স্রোতের টানে সে ভেসে চলে।

তাছাড়া কর্মজীবন ও সংসার জীবনের নানা স্ট্রেস ব্যক্তিত্বকে বারবার আঘাত করে। প্রমত্তা নদীর ঢেউ বার বার পাড়ে আঘাত করলে কী হয় ? পাড় ভেঙে যায়। তেমনি স্ট্রেস মানুষের ব্যক্তিত্বকে বার বার অঘাত করলে তার ব্যক্তিত্বের ধরণটাই পালটে যায়। অনেক মধুর ও প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব খিটখিটে বদমেজাজি হয়ে ওঠে। নানা হতাশায় দীর্ণ ব্যক্তিত্ব একটুতেই সন্দেহ প্রবণ হয়। সে সময় দরকার 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট'। ভেঙে পড়া বিপথগামী ব্যক্তিত্বকে কীভাবে আবার স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করে দেয় এই স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট। এ সম্পর্কে যারা উৎসাহী ও বিশদ জানতে চান তাঁদের দেজ পাবলিশিং থেকে সদ্য প্রকাশিত হতাশ হবেন না ১ম, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড সংগ্রহ করে পড়ে নিতে অনুরোধ করবো। ইমোশান অর্থাৎ ভাবাবেগ তথা মানসিক চাঞ্চল্য ব্যক্তিত্বের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে একবার দেখা যাক।

অফিসে কোনও একটা সুবিধা আদায় করার জন্য বড়সাহেবের কাছে যেতে হবে। বড়সাহেবের মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। আপনি কী সেই মুহূর্তে বড় সাহেবের ঘরে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে যাবেন ? বড়সাহেব হয়তো কিছুক্ষণ আগেই কম্পানির সেলস কমে যাচ্ছে বলে মালিকের কাছে ধমক খেয়ে এসেছেন। অথবা গতকাল রাতে প্রচুর পান করার ফলে তাঁর হ্যাং ওভার কাটেনি। অথবা তাঁর বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া চরমে উঠেছে। স্টেনোর সঙ্গে তাঁর প্রেম বউ জানতে পেরেছে। অথবা ছেলের খুব অসুখ। আবার খুব তুচ্ছ কারণ—মোহনবাগান হেরে গেছে তার জন্যও বড় সাহেবের মেজাজ খারাপ থাকতে পারে। এখন বড়সাহেব বলে তাঁর মেজাজ খারাপকে সবাই পাত্তা দেবে। কারণ কর্মচারীরা তাঁর অধীন। তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি তাদের ভাল করতে পারেন আবার খারাপও করতে পারেন। তাই সবাই তাঁর মেজাজকে পাত্তা দেয়। আর এটা যেন একটা দুষ্ট চক্র। সবাই পাত্তা দেয় বলেই তিনি কথায় কথায় মেজাজ দেখান। ঠিক শিশুর মত অবস্থা। শিশু কাঁদলে সবাই তটস্থ। একটু কাঁদলে সবাই ছুটে এসে তাকে খেলনা দেয়, চুষিকাঠি মুখে গুঁজে দেয়, কোলে নিয়ে ঘোরে। শিশু একটু বড় হলে বায়না করে। সঙ্গে সঙ্গে তার বায়না পূরণ করা হয়। আর যতই বায়না পূরণ হয়, ততই সে বায়না করে।

ক্ষমতাবান ব্যক্তি যতক্ষণ না উপলব্ধি করছেন যে তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য লোকে তাঁকে ঘৃণা করে আর সব সময় রাগারাগি করার ফলে তাঁর শরীরও খারাপ হয়। প্রসন্নতা ও আনন্দই সুস্থতার লক্ষণ ততক্ষণ তিনি ক্ষমতামদে মত্ত হয়ে মেজাজ দেখিয়েই যাবেন। ইমোশানকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন না তিনি শেষ পর্যন্ত ক্ষ্যাপাটে ও অব্যবস্থচিত্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। সুতরাং ইমোশান নিয়ন্ত্রণ করতে পারাটাই সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

তা নাহলে সামান্য ইমোশানেই অনেক লোক মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারেন। ইমোশান অর্থাৎ ভাবাবেগ বা মানসিক চাঞ্চল্যকে সবসময় বার করে দিতে হয়। তাকে ভেতরে পুষে রাখলেই দেখা দেয় মানসিক ও দৈহিক উপসর্গ। দৈহিক উপসর্গের মধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ, হজমের গোলমাল, অনিদ্রা, মাথাধরা অ্যালার্জি, পেপটিক আলসার। ভাবাবেগ থেকে মুক্তির সহজ সরল উপায় (১) অকপট হওয়া। নিজের উপর বিশ্বাস থাকলেই অকপট হওয়া যায়। নিজের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হোন ও সেকথা মুক্ত কণ্ঠে লোককে বলুন। সর্বপ্রকার গোপনীয়তা থেকে মুক্ত হন। কর্মসূত্রে যেসব তথ্য গোপন রাখতে হয় একমাত্র সেসব ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু গোপন করবেন না। নিজেকে করুন একটি খোলা বই এর মত। (২) অপরকে সাহায্য করুন। মানুষকে বিশ্বাস করুন। সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরাও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কিন্তু অপরকে বিশ্বাস করা মানে নিজের উপরেই বিশ্বাস রাখা। সেই বিশ্বাসটা হল এই—আমি কারও ক্ষতি করিনি। অতএব আমার কেউ ক্ষতি করতে পারবেনা। ৩) সবশেষ উপদেশটি হল, নিজের কর্মশক্তি ও দৈব উভয়ের উপর আস্থা রাখা। আমার যা করণীয় আমি করে যাবো। বাকীটা দৈবের হাতে। শুধু এইটুকু মনে রেখে কাজ করলেই দেখবেন ব্যক্তিত্বের চরিত্রই বদলে যাচ্ছে। যাঁদের মধ্যে এই ব্যক্তিত্ব দেখবেন, বুঝবেন তাঁরা সুস্থ স্বাভাবিক এবং যথার্থ মানুষ।

জীবন রসিক মানুষ ঃ মানুষ চেনার ব্যাপারে একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি মানুষই আলদা। কারণ একএকজন মানুষের বিদ্যেবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা আর একজনের থেকে আলাদা। আবার আমরা যাকে খুব বিদ্বান বলে মনে করি, হয়তো সে স্কুল কলেজের পরীক্ষায় উতরে যাওয়ার কলাকৌশল জানে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে হয়ত খুবই 'বায়াসড' অর্থাৎ সে কোন ঘটনা নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারেনা। তার ফলে তার সমস্ত সিদ্ধান্ত ভুল হয় এবং বাস্তব জীবনে সে ব্যর্থ হয়।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সব সময় অন্যের দোষত্রুটির কঠোর সমালোচনা করেন। যদিও ত্রুটি মুক্ত মানুষ কেন, দেবতাও খুঁজে পাওয়া যায়না। কিন্তু এই সমস্ত লোকেরা সব সময় প্রত্যেকের সমালোচনা করেন।

বিশেষ করে কেউ যদি প্রথাবিরুদ্ধ ও সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ কোন কাজ করে থাকেন তাহলেতো কথাই নেই।

অন্যের সম্পর্কে কট্টর অসহিষ্ণু হবার মনস্তাত্ত্বিক কারণ হল, প্রত্যেক সমাজেরই একটা সামাজিক আচরণ বিধি আছে। যদি কেউ সেই আচরণ বিধি মেনে না চলে তাহলে অন্যেরা তার সমালোচনা করে। যদি দেখা যায় কোন লোক নিজেই সেই আচরণ বিধির বিরোধী কিছু কাজ করেছে তাহলে সে সমাজের নৈতিক

মান বজায় রাখতে পারেনা। তখন তার নিজের মধ্যেই এক ধরণের অপরাধবোধ আসে। সেই অপরাধবোধ থেকে সমালোচনা বেশি করতে শুরু করে। যার মধ্যে অপরাধবোধ যত প্রখর অন্যের বিরুদ্ধে তার গলার জোর তত বেশি।

আমার কর্মজীবনে দেখেছি যে অফিসার ব্যক্তিগত জীবনে যত চুরি করত দুর্নীতির বিরুদ্ধে সে তত গলাবাজি করত।

বিশেষ করে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের স্ত্রীরা কথায় কথায় প্রায়ই লোককে শোনাবেন, উনি যদি ঘুষ খেতেন তাহলে কত টাকা করতে পারতেন। কিন্তু উনিই চুরি করতে পারলেন না।

আমি যখন বাড়ি করছি তখন একজন মন্ত্রীর স্ত্রী আমার বাড়ি দেখতে এসেছিলেন। ওই মন্ত্রীর বেনামীতে বিভিন্ন জায়গায় কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। উনি বাড়িটা দেখে অম্লান বদনে বললেন, ওঁকে কত করে বলেছিলাম, একটা মাথা গোঁজার জায়গা করো, উনি আমার কথায় কান দিলেন না।

ওনার মত সৎমানুষ এযুগে অচল। শুনে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না।

অসহিষ্ণুতা বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয়। সে সময় মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে যত অবহিত হয় ততই সে অন্যের ছিদ্রান্বেষী হয়ে ওঠে। দেখবেন এই বয়সের ছেলেরা সবাইকে সমালোচনা করছে। কাউকে আদর্শ বলে মানতে পারছেনা। এই অবস্থা চলে যৌবন পর্যন্ত। অসহিষ্ণুতার ফলে অনেক সময় মানুষ স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে।

যাঁদের নিজেদের চরিত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি কম তারা অন্যের সমালোচনা করেন না। আপন মনে নিজের কাজ করে যান। নিজেকে যতটা সম্ভব নিষ্কলুষ রাখার চেষ্টা করেন। সৎ ব্যক্তিরা কদাচ নির্বিচারে সবাইকে চোর বলেন। কিন্তু যে নিজে চোর অন্যকে চোর না বলা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

একধরণের মানুষ আছেন যাঁরা হিউমার বা হাস্যরস ভালবাসেন। তাঁরা কথায় কথায় জোক করেন। নানারকম হিউমার বা হাস্যরসের অবতারণা করে বহু নীরস মুহূর্তকে লঘু করে দেন।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে হাস্যরস সকল রসের সেরা। একমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই এই হাস্যরসের প্রবাহ বইয়ে দিতে পারেন। কারণ হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে হাস্যরস-বোধ থাকা দরকার। আর হাস্যরস মানে ভাড়ামো নয়। শুধু তাই নয়, হাস্যরস বুঝতে গেলেও হাস্যরস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। তবে হিউমর করতে গিয়ে অনেকে বেশ মুশকিলে পড়েন। কারণ স্থান কাল পাত্র বুঝে হিউমর না করলে হিউমর বা উইট শেষ পর্যন্ত কোনও কাজে আসেনা। উলটে বিপত্তি বাঁধাতে পারে।

কোনও মানুষের হাস্যরস সৃষ্টির ধরণ দেখে তার বৈদগ্ধ মনীষা ও বুদ্ধিবৃত্তির

পরিমাপ করা যায়। যিনি স্থূলবুদ্ধির লোক তিনি ভাঁড়ামো করবেন। তাঁর রসিকতা পরিণত হবে ছ্যাবলামো ও অশ্লীলতায়।

কোনও ব্যক্তি বা বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রসিকতা করা তাঁরই সাজে যাঁর আত্মবিশ্বাস প্রবল। উইট এবং হিউমার এককথায় রসিকতা সকলের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করে কিন্তু সমস্ত হাস্যরসের পিছনে উইট ও হিউমর থাকেনা। লোকে অন্যের দুর্দশাতেও হাসে। তবে মতলবহীন অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম ব্যক্তিত্বকে সকলে পছন্দ করে। কারণ প্রতিটি লোকই কোনও না কোনওভাবে নানা উদ্বেগ অশান্তিতে ভোগেন। প্রাণখুলে হাসতে পারলে টেনসন কেটে যায়। মন মেজাজ অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়।

হাস্যরস বুঝতে পারার ক্ষমতা এবং সময়মত হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতাকে কৌতুকবোধ বলে। কৌতুকবোধ মার্জিত ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণ। কিন্তু আগেই বলেছি সূক্ষ্ম কৌতুক ধরার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি চাই, মার্জিত মন চাই এবং যথেষ্ট পড়াশোনা থাকা চাই।

যখন কৌতুকের কথা বা গল্প হয় তখন সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে সবাই যে কৌতুকের মর্ম উপলব্ধি করেন তা নয়, কিন্তু সবাই হাসেন। তাঁরা ভাব দেখান যে কৌতুকটি তাঁরা বুঝেছেন।

জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য আপনাকে মজলিশী স্বভাবের হতে হবে। মজলিশী ব্যক্তিত্ব হল, নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কৌতুককর করে লোকের কাছে বলতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে নিজেকে জাহির করার কোনও ব্যাপার থাকবে না। একটু নির্লিপ্তভাবেই গল্পগুলি করবেন। সভাসমিতির ভাষণের মধ্যেও একটু সরস করে বলতে পারলে দেখবেন লোকে পছন্দ করছে। বক্তা কী বলছে তার চেয়ে কেমন করে বলছে সেটাই লোকে বেশি পছন্দ করে।

আমি বহু সভাসমিতিতে দেখেছি সভার যে আলোচ্য বিষয় তার ধারে কাছে না গিয়ে আবোল তাবোল বলেও অনেক বক্তা দর্শকদের হাততালি পাচ্ছেন। এর কারণ তিনি বক্তৃতা দেওয়ার বৈঠকী মেজাজটি আয়ত্ত করেছেন। অনেক গল্প বানিয়ে শ্রোতাদের শুনিয়েছেন। মাঝে মাঝে রসসৃষ্টি করছেন। ক্লাশেও যে অধ্যাপক সব ছাত্রকে হাসাতে পারেন তিনি জনপ্রিয় শিক্ষক বলে পরিচিত হন। প্রকৃত রসিক ব্যক্তিরা কিন্তু অন্যকে নিয়ে নয় নিজেকে নিয়েই রসিকতা করেন। নিজের দুর্বলতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও বুদ্ধিহীনতাকে নিয়ে যিনি রসিকতা করে লোক হাসাতে পারেন, তিনিই প্রকৃতরসিক ব্যক্তিত্ব। যদি কেউ রসিকতার নাম করে শুধু নিজের গুণগান করে যান, তাহলে বুঝতে হবে তিনি অহংকারি অথবা যদি কেউ শুধু অপরের সমালোচনা করে যান তাহলে বুঝতে হবে জগৎ সংসার সম্পর্কে তিনি খুবই সিনিক। ব্যক্তিগত জীবনে নানা ঘা খেয়েছেন সেটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাহলে তিনি সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া কিছুই নন।

কিন্তু রসিকতা করে নিজের জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও বেদনাকে উড়িয়ে দেওয়া এক বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। এই জীবনবোধ ও রসবোধই গভীর দার্শনিক মননের পরিচয়।

একবার ভাবুন সক্রেতিসের কথা। তাঁর পত্নী ছিলেন এক দজ্জাল মহিলা। স্বামীকে কোনওদিনও শান্তি দেননি।

তিনি যখন হেমলক পান করবেন ঠিক তার আগে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁর সামনে মড়াকান্না কাঁদতে লাগলেন। ওগো আমায় ফেলে কোথায় চললে গো, সক্রেতিশ কোনও কথা বলছেন না। নির্বাক, নিশ্চুপ।

এমন সময় কারারক্ষী এসে জানাল। আর সময় নেই। এইবার আপনার হাতে বিষের পাত্র তুলে দেওয়া হবে। তার আগে আপনার কোনও শেষ ইচ্ছা থাকে তো বলুন। সক্রেতিশ বললেন, দুটি শেষ ইচ্ছা আছে। একটি হল, কিছুদিন আগে এক শিষ্যের কাছ থেকে একটা মুরগি ধার করে খেয়েছিলাম, তার দামটা কেউ দিয়ে দেবেন। আর দুনম্বর ইচ্ছেটা হল—

দুনম্বর ইচ্ছা ?

সক্রেতিশ তাঁর ক্রন্দনরতা স্ত্রীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, দয়া করে এই ভদ্রমহিলাকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন।

এর চেয়ে বড় রসিকতা আর কি হতে পারে ?

মিনমিনে মানুষ ঃ অনেক মানুষ মিনমিনে স্বভাবের। অতি বিনয়ী হওয়া ভাল নয়। এদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোভাব থাকেনা। ক্লাশে দেখবেন মাস্টার মশাই প্রশ্ন করছেন, ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই চুপচাপ। একটা আলোচনা হয়ে গেল, তারা নীরব শ্রোতা। দায়িত্ব নিয়ে যেখানে কথা বলতে হবে সেখানে তারা নেই। চাকরি জীবনে দেখেছি, কোনও সহকর্মীর ব্যাপারে অন্যায় হয়েছে, প্রতিবাদ করতে হবে—প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্কমূলক কোনও প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীরাও অনেকে অংশ নিতে চান না, কী জানি বাবা, সরকার যদি চটে।

এই ভীরু দুর্বল প্রকৃতির মানুষেই দেশ ভরে যাচ্ছে। এরা কেন ভীরু কারণ এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব। কেন আত্মবিশ্বাসের অভাব ? এর উত্তর ছেলেবেলা থেকে এদের বাবা মা এদের স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করতে দেয়নি। পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে বাবা মায়েরা অনেক ছেলে মেয়েকে সংসারের প্রতি দায়িত্বমুখী করে তোলেনা। বুড়ো বাবা বাজার করে আনছে, মা রেশন নিয়ে আসছে, ছেলেমেয়েরা বাড়িতে টিভি দেখছে, ঘুমোচ্ছে অথবা ফোনে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেমেয়ে ক্লাশ সেভেন এইটে পড়ছে তবু বাবা মা তাদের স্কুলে পৌঁছে দিচ্ছেন, নিয়ে আসছেন। বড় ছেলেমেয়ের জামা কাপড়ও কেচে দেন

মা এমনকি জুতো পালিশও করে দেন। সেদিন খুশবন্ত সিং বলছিলেন, ছেলেমেয়ে কোন স্কুলে পড়বে, কী পড়বে ঠিক করে দেন বাবা মা।

মনস্তত্ত্ববিদ এলিজাবেথ হারলক বলছেন, ঈoo much love leads to excessive mothering, or over protectiveness, and is as bad psychologically as too little.

বাবা মায়ের সামান্য ভালবাসা যেমন খারাপ তেমনি অত্যধিক ভালবাসাও খারাপ।

মনস্তত্ত্ববিদ জন বি ওয়াটসন বলেছেন, অত্যধিক মাতৃস্নেহ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী হয়ে ওঠে।

সুতরাং যদি কোন ছেলে বখে যায়, স্বার্থপর হয়ে ওঠে তাহলে বুঝবেন ছেলেবেলায় মায়ের অত্যধিক আদরে অমন হয়েছে।

শুধু তাই নয়, ছেলেবেলায় বেশি আদর পেলে বড় হয়ে সেই ছেলেমেয়ের মনে আদর ভালবাসার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা গড়ে ওঠে। কেউ যদি তাকে ভালবাসা দেখাতে যায় তাহলে সে তখন তার মর্যাদা দেয় না। **যারা বাবা মায়ের একমাত্র আদুরে মেয়েকে বিয়ে করে সেই স্বামীর জীবন পরবর্তীকালে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কারণ আদর ভালবাসা পেয়ে তার কাছে স্বামীর ভালবাসার কোনও আলাদা মূল্য নেই, বরং তার অবচেতন মনে অত্যধিক ভালবাসা থেকে জন্মায় ঘৃণা। কারণ ঘৃণা ভালবাসারই আর এক পিঠ।**

অনুরূপভাবে বাবা-মায়ের একমাত্র আদুরে ছেলের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। তাকে যে মেয়ে বিয়ে করে তাকেও সারা জীবন ধরে জ্বলতে হয়। বিশেষ করে মায়ের ভালবাসা তখন অক্টোপাশের মত তার বুড়ো খোকাকে আঁকড়ে ধরে। প্রবৃত্তির জঠর থেকে যে ভালবাসার জন্ম, যার মধ্যে বুদ্ধি নেই, বিচার নেই, ত্যাগ নেই, সেই ভালবাসা মানুষের জীবনে এক প্রলয়ংকর ঝড়েরমত।

এই অবাস্তব ভালবাসা ছেলেমেয়ের কাছ থেকে শুধু প্রত্যাশার পর প্রত্যাশা সৃষ্টি করে, ছেলেমেয়ে সর্ববিষয়ে কৃতী হবে, ধনী হবে, সফল হবে এবং বাবা মায়ের উপর চিরকাল থাকবে অচলা ভক্তি। অদৃশ্য স্নেহের সুতো টেনে তাদের দিয়ে পুতুল নাচ করাবেন বাবা মা এই সংসার রঙ্গমঞ্চে, এই আশা করেন তাঁরা।

বিশেষ করে প্রথম সন্তানকে ঘিরেই এই আশা বেশি হয়, কিন্তু ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যখন স্নেহের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হতে চায় তখনই বাধে বিপত্তি। কারণ স্বাধীনতার দাবি স্বৈরতন্ত্রীদের কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ।

নৈরাশ্যবাদী মানুষ ঃ নকসাল আন্দোলনের সময় আমরা একটি সরকারি ফ্ল্যাটে থাকতাম। সেই হাউসিং এস্টেটে এক বৃদ্ধা বাস করতেন। তাঁদের দুই ছেলে মেয়েই নাকি অসুখে ভুগে মারা যায়। ভদ্রমহিলা তাই খুব হতাশ ছিলেন। ব্যক্তিগত

জীবনেও ছিলেন নৈরাশ্যবাদী। তিনি নকসালদের সমর্থন করতেন ও ছোট ছোট ছেলেদের বলতেন নকশাল হয়ে যেতে। শেখাতেন পুলিশের উপর অ্যাকশন করতে। সে সময় অনেক রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করে নকশালরা। তিনি ছোটছোট ছেলেদের বলতেন, তোরা কেউ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিকে খুন করতে পারিস ? ওটাকে কেউ মারতে পারছে না। ভদ্রমহিলা কখনও প্রিয়কে দেখেননি, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা দূরে থাক, তবে তিনি কেন একথা বলতেন ? আসলে তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা হতাশা থেকে তিনি সমাজনেতাদের ঘৃণা করতে শিখেছিলেন।

আপনারা যদি দেখেন কেউ অকারণে অন্যকে গালমন্দ করছেন, তাহলে বুঝবেন তিনি পারিবারিক জীবনে না হয় কর্মজীবনে কোথাও ঘা খেয়েছেন।

যদি খুব হিংসাপরায়ণ লোক দেখেন বুঝবেন তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সুখী নন।

হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিরা কিছুতেই হিংসা চেপে রাখতে পারেন না। কীভাবে তাঁরা হিংসার প্রকাশ করেন তা কয়েকটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে।

হিংসুক ব্যক্তিরা বিনা মতলবে কারও প্রশংসা করেন না। আপনার কোন জিনিস সমস্ত লোক ভাল বললেও তাঁরা কিছুতেই ভাল বলবেন না। একটা না একটা ত্রুটি খুঁজে বার করবেন। একজন সাংবাদিক আমাকে বড় বড় মনীষীদের সম্পর্কে নানা কেচ্ছার কথা শোনাতেন। তিনি বলতেন, অমুক প্রাতঃস্মরণীয় হাইকোর্টের বিচারপতি, শিক্ষাবিদ ও উপাচার্যের চরিত্রের দোষ ছিল। তিনি পর্ণোগ্রাফি পড়তে ভালবাসতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাকি দেনার দায়ে বন্ধক দেওয়া বাড়ি ছাড়াতে না পেরে দান করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ফাইলেরিয়া ছিল বলে তিনি সেটি ঢাকতে আলখাল্লা পরতেন।

বিখ্যাত লোকদের নিয়ে স্ক্যান্ডাল রটে, কারণ তাদের সকলে চেনে। কুৎসা রটনা করা হয় অপরের সামনে। এখন যার নামে কুৎসা রটনা হচ্ছে তাকে যদি অন্যপক্ষ না চেনে তাহলে সেতো শুনতে আগ্রহী হবেনা। এজন্য যে সমাজে সবাই সবাইকে চেনে সেই সমাজেই শুধু সাধারণ মানুষকে নিয়ে আলোচনা হয়। বড় শহরে নগরায়ণের ফলে প্রচুর লোকজন এসে গেছে। সেখানে অপরিচিত সাধারণ লোকদের নিয়ে কেউ আলোচনা করেন না।

গ্রামে সবাই সবাইকে চেনে, তাই গ্রাম্যজীবনে ঈর্ষা বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু ঈর্ষা যেহেতু মানুষের সহজাত ধর্ম সেহেতু পরিচিত বৃত্তের মধ্যে ঈর্ষা ঘোরাফেরা করে। কর্মক্ষেত্রে, পাড়ায় যেখানে সকলে সকলকে চেনে, সেখানে চারপাঁচজন লোক একত্র হলেই আপনি হতাশ ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের দেখতে পাবেন। যারা কোনও না কোনও লোকের নিন্দা করছে।

সবচেয়ে মজা হল, নিন্দুক লোকের কাছে নিন্দাটাই বড়—সে নিন্দার পাত্রে কোনও ভেদাভেদ করেনা। কারণ নিন্দাবাদতো এক ধরণের মানসিক অসুখ।

আপনি হয়তো নিন্দুকের মুখে আপনার পরিচিত কারও নিন্দা খুব উপভোগ করলেন, কিন্তু আপনি জানেন না, যে মুহূর্তে আপনি পিছন ফিরবেন নিন্দুকের নিন্দার পাত্র হবেন আপনি।

নিন্দার বিষয় অনেক কিছুই হতে পারে। আমার মনে আছে বহুকাল আগে আমার বিবাহে আমি আমার সমস্ত জমানো টাকা নিঃশেষ করে প্রচুর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু নিন্দুকেরা তাও ছাড়লেন না। বললেন, এত লোককে নিমন্ত্রণ করায় আত্মীয় স্বজনকে ভালভাবে আপ্যায়ণ করা হয়নি। তাদের অবহেলা করা হয়েছে। আমরা হলে কিছুতেই এমনটি করতে পারতামনা।

নিন্দুকেরা ভীষণরকমের নৈরাশ্যবাদী। তাঁরা আধগ্লাস জল দেখলে বলবেন, মাত্র আধগ্লাস জল। আশাবাদী বলবেন, তবুতো আধগ্লাস জল পেয়েছি। মোটে না পাওযার চেয়ে কিছুটা পাওয়া অনেক ভাল।

নিন্দুকদের আলোচনার বিষয় হল অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি। বিশেষ করে অর্থঘটিত ও নারীঘটিত অপবাদ দিতে পারলে তাঁরা আর কিছুই চাননা। তা নাহলে চাকরির ক্ষেত্রে অদক্ষতা, কাজে ফাঁকি ও দুর্নীতির অপবাদ দেওয়া হয়। যে একবার হিংসুক স্বভাবের হয়ে যায় সে অন্যের কোনও কথাও বিশ্বাস করেনা। অন্যের সাফল্যকে সে তুচ্ছ করে দেখে। কারও কৃতিত্ব দেখলে সে বলে, এ আর এমন কি কাজ। আমাদের দিলে আমরাও পারতাম।

কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে, বা কোনও পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করতে হলে আগে থেকে খোঁজ খবর করে নেবেন তার মধ্যে হতাশা বা হীনমন্যতা আছে কিনা। তিনি নিজেকে বঞ্চিত বলে মনে করেন কিনা। তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস আছে কিনা।

একজন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ব্যক্তি চট করে কাউকে ঈর্ষা করবেন না। আর যিনি কাউকে ঈর্ষা করবেন না তিনি চটকরে কারও অকারণ গালমন্দ করবেন না।

দ্বিতীয়ত কোনও ব্যক্তির মনোভাব বা emotion তার ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধরুন কেউ যদি শারীরিক অসুস্থ থাকে, সে সময় আপনি যদি তার সঙ্গে দেখা করেন তাহলে তিনি হয়তো খুব ভাল করে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে তিনি আপনাকে ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেলেন। এটি নাও হতে পারে।

ধুত্তোর আমি চললাম

ভাবপ্রবণ মানুষ ঃ মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে আর একটি বস্তু সেটির নাম ভাবাবেগ বা ইমোশান।

ইমোশান কিন্তু সব সময় মানুষের ক্ষতি করেনা বরং ইমোশান মানুষকে সব সময় বড় কাজ করার প্রেরণা জোগায়। ইমোশান মানুষকে সমাজের সঙ্গে সমঝোতা করতে শেখায়। তাকে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে শেখায় ও তার ভেতরকার সুকুমার প্রবৃত্তি ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। অন্যদিকে ইমোশনের আধিক্য জীবনকে বিষময় করে তোলে।

ইমোশন সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করিয়ে তাকে ভগবান বুদ্ধে রূপান্তরিত করেছিল। আবার ইমোশান বহু বিষাদগ্রস্ত মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। আবার ইমোশান নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার ফলে সে লোকটি পাগল হয়ে গিয়েছে। ইমোশান মানুষের যা ভাল করে তা হল,

১. মানুষের মধ্যে দয়ামায়াবোধ সঞ্চারিত করে। অপরের দুঃখ দেখে ভাবপ্রবণ হয়ে মানুষ সে দুঃখমোচনের জন্য ছোটে। রাস্তার ধারে কত ভিখারিই তো পড়ে আছে। অন্য মানুষ দেখেও দেখছে না। কিন্তু মাদার তেরেসা এই ভিখারিদের দুঃখে অভিভূত হয়ে তিনি তাদের জন্য আশ্রয় এর ব্যবস্থা করেন। গান্ধীজী গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের কৌপীন পরতে দেখে নিজে কৌপীন পরতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুকুন্দদাসের ভেঙ্গে ফেল কাঁচের চুরি গানটি শুনে কত বঙ্গনারী তাঁদের কাঁচের চুড়ি ভেঙে ফেলেছেন।

২. রাগ-অনুরাগ সৌন্দর্য প্রীতি, সাহিত্য ও কলা নাটকের প্রতি অনুরাগ

সমস্তই ভাবপ্রবণ মনের সৃষ্টি। শূন্য বা নিরপেক্ষ মনে কোন বড় সৃষ্টি হতে পারেনা। বড় সৃষ্টির জন্য প্রবল ভাবাবেগের দ্বারা মনকে সেই বিষয়ের দিকে তাড়িত হতে হয়। একজন ভক্ত যখন কৃষ্ণনাম করেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে। একজন লেখক যখন গল্প উপন্যাস লেখেন তখন তিনি চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান এমনকি একজন অভিনেতা যখন কোনও চরিত্রে অভিনয় করেন তখন সেই চরিত্রের মত তিনি আচরণ করেন।

৩. ভাবপ্রবণতা বা ইমোশনই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে অন্তরঙ্গ করে। দুজনে দুজনের কাছে টেনে আনে। অনেক মা সন্তানকে ছেড়ে অন্যপুরুষের সঙ্গে চলে যান। এক্ষেত্রে সন্তানের প্রতি তাঁর যে ইমোশান তা তত তীব্র নয়। আবার অন্য পুরুষের প্রতি তাঁর ইমোশান তীব্র। অন্যদিকে দেখা যায়, পাতানো মা বা কোনও নারীকে মা বলে ডেকে তার প্রতি নিজের মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসা প্রকাশ করছেন কেউ। দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক দুই ভাই-এর সম্পর্কের চেয়েও নিবিড় হয়। এও ভাবপ্রবণ মনের ভূমিকা।

অন্যদিকে ভাবপ্রবণতার আতিশয্য ঘটে গেলে ব্যক্তিত্বের সংকট দেখা দেয়।

১. অনেকে বিশেষ পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়ে বিসদৃশ আচরণ করেন। পরে তার জন্য তাঁদের নিজেদের অপরাধী বলে মনে হয়।

২. হঠাৎ আনন্দের আতিশয্য ঘটলে ভাবপ্রবণতার আবেগে অনেকে এমন আচরণ করেন যার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণের কোনও সঙ্গতি থাকে না। সে সময় অনেকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেন। আবেগে উচ্ছসিত হয়ে কাউকে জড়িয়ে থাকেন। কেউ কেউ কেঁদে ফেলেন।

৩. হঠাৎ শোক পেলেও আবেগ প্রবণ মানুষ এমন ছেলেমানুষের মত আচরণ করেন। কোনও ব্যাপারে দুঃখ পেলে, বা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হলে অথবা নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত বোধ করলে, অনেকে ডিপ্রেসনে ভোগেন। কেউ আত্মহত্যা করতে যান।

আবার ভাবপ্রবণতা যাদের মধ্যে নেই তাঁরা ব্যবহারিক জীবনে সফল। কিন্তু তাঁরা রবোটের মত উত্তাপহীন ও প্রাণ হীন। এমন মানুষকে বলা হয় প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তববাদী। কিন্তু এই তথাকথিত বাস্তববাদীরা প্রচুর টাকা পয়সা উপার্জন করেন এবং যেহেতু তাদের মধ্যে ভাবপ্রবণতা নেই, সেহেতু তাদের কোনও মূল্যবোধও নেই। এঁরা নিজেদের প্রয়োজনের জন্য যে কোনও কাজ করতে পারেন।

অসামাজিক মানুষ ঃ আমি কলকাতার যে এলাকায় থাকি সেটি শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের এলাকা। আমি বৃদ্ধ বয়সে একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসি।

তাছাড়া আমার স্বভাবটিও মিশুকে প্রকৃতির। কিন্তু এই এলাকায় এসে দেখলাম, পাড়ায় কেউ কাউকে চেনেনা। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনা। একই পাড়ার লোকজনকে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে আমি মাঝে মাঝে উপযাচক হয়ে আলাপ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁরা পাত্তা দেননি। আমি দেখলাম এই এলাকায় এসে আমি ক্রমশ অসামাজিক হয়ে যাচ্ছি।

আবার পাড়ার সবাই যে অসামাজিক একথা বলা যায় না। পাড়ায় একটি ক্লাব আছে। অনেকেই সেই ক্লাবে গিয়ে তাশ খেলেন। আড্ডা দেন। পুজোর সময় থিয়েটারও করেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট হৃদত্য আছে। কিন্তু তাঁরা কেউ আমাকে বেশি পাত্তা দিতে চাননা। যদিও তাঁরা জানেন, আমি নেহাৎ ফালতু লোক নই। বরাবর গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেছি। লেখাপড়াও ভাল শিখেছি। আমি ক্লাবে নিয়মিত চাঁদা দেই। চাঁদা চাইতে এলে ভদ্র ব্যবহার করি। তা সত্ত্বেও ওঁরা আমার প্রতি বিরূপ কেন ?

এরফলে আমি প্রবল অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আমার এই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাটা আমার ইচ্ছায় হয়নি। এটি আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি মিশুকে লোক হলে কী হবে পাড়ার লোকেরা আমার সঙ্গে মিশছে না। ফলে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। কিন্তু আমার এই বিচ্ছিন্নতা স্বেচ্ছামূলক মনস্তত্ত্বের ভাষায়—Involuntary isolates.

এখন এই মুহূর্তে আপনি যদি আমায় দেখেন তাহলে দেখবেন, আমি অধিকাংশ সময় বাড়িতে বসে নিজের কাজ করছি। কিন্তু আমাকে যিনি দেখবেন তিনি বলবেন, পার্থবাবু মিশুকে নন। দেখে এলাম উনি পাড়ার কারও সঙ্গে মেশেননা। বাড়ির মধ্যেই বসে থাকেন।

দেখুন, আপনার লোক চেনার গর্ব কত সহজেই ভেঙে যেতে পারে। কাউকে অহংকারি বলার আগে বিচার করে দেখুন লোকটি সত্যিই অহংকারি না বিশেষ পরিস্থিতির ফলে সাময়িকভাবে গুটিয়ে আছে। অনেক সময় মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেরা এই ভুল করে। একটি মেয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলছে না। বা আপন মনে কারও দিকে না তাকিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বলে মনে করার কারণ নেই সে খুবই দেমাকি। আসলে সে হয়তো লজ্জায় আগ বাড়িয়ে কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেনা। কিন্তু কোনও ছেলে যদি যেচে তার সঙ্গে আলাপ করে তাহলে সে বন্ধুত্ব করতে রাজি। এমন ঘটনা আকছার হচ্ছে। এমনকি শুধু মুখ ফুটে বলতে না পারার জন্য কত অস্ফুট প্রেমের শিশু অবস্থাতেই মৃত্যু হচ্ছে। ট্রেনে যে সহযাত্রীকে খুবই গম্ভীর বলে মনে হচ্ছে, মুখফুটে তার সঙ্গে আলাপ করুন, দেখবেন চমৎকার লোক। কোথা থেকে গল্পে গল্পে সময়টা বেশ কেটে যাবে। অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করে অনেকে যেমন প্রতারিত হয়েছেন, অনেকে তেমন আবার বিপদেও পড়েছেন। হয়তো সহযাত্রী একজন

প্রতারক। তিনি খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে আপনাকে অচৈতন্য করে রাতের দিকে সব মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে চম্পট দিতে পারেন। কিন্তু এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে। তার চেয়ে অসংখ্য ঘটনার কথা জানি, যেখানে অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ ক্রমে হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছে। এখন আপনি নিজে আলাপি হয়েও সহযাত্রী প্রতারক হতে পারে ভেবে চুপচাপ বসে আছেন। সহযাত্রী আপনাকে ভাবছে অসামাজিক। আবার সহযাত্রীও আপনার সম্পর্কে এই কথাই ভাবছে। যে কোনও লাজুক ব্যক্তি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অন্যের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারেন না। এর ফলে লাজুক ও সঙ্কুচিত ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে সমাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। তাঁরা কিন্তু লোক খারাপ নন। তাঁরা বিনয়ী, ভদ্র, শিক্ষিত এবং অনেকেই হয়তো প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁরা লাজুক, এইজন্য অন্যরা তাঁদের ভাবেন অহংকারি। এই ভেবে সাধারণ মানুষ তাঁদের সঙ্গ পরিহার করেন।

আর এক ধরণের মানুষ আছেন তাঁদেরও লোকে অহংকারি ভাবে। তাঁরাও নিজেদের স্বেচ্ছায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দেন। তাঁরা হলেন সাধারণ মানুষ। এঁদের মধ্যে কোনও বিশেষ গুণ বা প্রতিভা নেই। তাই যে কোনও প্রতিভাবান বা নামী লোকের সামনে দাঁড়াতে তাদের খুব সঙ্কোচ হয়। দেখবেন ক্লাশের ফার্স্টবয় বা চাকরি জীবনে বস সর্বদাই একাকীত্বে ভোগেন। জোর করে তাঁদের সমাজ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কারণ সাধারণ মানুষ তাঁর সঙ্গে মিশতে ভয় পান, পাছে তাঁদের সাধারণত্ব অসাধারণ মানুষটির কাছে ধরা পড়ে যায়। ফার্স্ট বয় এজন্য ক্লাশে মেশার উপযুক্ত বন্ধু পায়না। তাই সে বেশি করে বই এর মধ্যে ডুবে থাকে। আর যতই সে বই-এর মধ্যে ডুবে থাকে, ততই সে ক্লাশের সহপাঠীদের বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হয় ও অহংকারি বলে বদনাম কেনে। কিন্তু ক্লাশের মাঝারি ও খারাপ ছেলেরা সহজেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব করে ফেলে ও ছাত্রজীবনকে এনজয় করে। কারণ তারাতো সবাই এক পর্যায়ের। তাই তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরী হয়না, এইজন্য দেখবেন শ্রমিক ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে যতখানি বন্ধুত্ব আছে অফিসারদের মধ্যে নেই। কারণ অফিসারদের সংখ্যা কম এবং তাদের মানসিকতার স্তর ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকেরই নিজেদের সম্পর্কে নানা ধরণের কমপ্লেক্স আছে। তাই তারাও এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী হয়ে যায়। কেউ কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র গড়ে তোলে না। তবে স্বেচ্ছায় নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এমন লোকও আছে। কি কি কারণে মানুষের মধ্যে সামাজিক মেলামেশার ইচ্ছাটা মরে যেতে পারে তার একটা খোঁজ নেওয়া যাক।

মানুষ মানুষের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা করে আনন্দ পাওয়ার জন্য। যখন সে জন্মায় তখন সে অসহায়। তার চৈতন্যের তখন উন্মেষ ঘটেনি। তাই

যারা তাকে বড় করে তোলে তাদের উপর সে নির্ভরশীল হয়। কিন্তু যখনই সে বড় হয় বুঝতে শেখে এবং পরিবারের বাইরে অন্যান্য সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে শেখে তখন সে তার পছন্দমত সঙ্গী বা বন্ধু নির্বাচন করে। এই প্রথম পারিবারিক বৃত্তের বাইরে অনাত্মীয় মানুষের সঙ্গে সে সম্পর্ক তৈরি করে। তার পছন্দ অপছন্দ তৈরি হয়ে যায়। দেখা যায় শিশু বাবা মায়ের চেয়ে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গই বেশি পছন্দ করছে। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু ছবছর বয়সের মধ্যে শিশুকে যদি বাবা মা তাদের স্নেহের বাঁধনে দিনরাত শুধু নিজেদের কাজেই রেখে দেন, সমবয়সী আরও দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আপনমনে খেলাধূলা করতে না দেন, তাহলে সেই ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ গড়ে ওঠে। সে লাজুক হয়ে ওঠে অথবা ভীষণ গর্বিত হয়। যার ফলে পরবর্তীকালে সে সমাজের সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনা। সে তখন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত হাঁসেদের মধ্যে বক যেমন অস্বস্তি বোধ করে এবং পালাতে পারলে বাঁচে, তেমনি যাঁদের মানসিকতা অত্যন্ত অনমনীয় (Rigid) কিছুক্ষণ পরেই সে পালিয়ে তার নিজের ঘরের মধ্যে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। একজন দার্শনিক বা সাহিত্যসেবী যদি এমন পাড়ায় বাড়ি করেন যে যেখানে তাঁর দর্শন চিন্তা ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে মত বিনিময় করার মত কোনও মানুষ নেই তাহলে তিনি পাড়ার কারও সঙ্গে মিশবেন না। এঁদেরই মনস্তত্ত্ববিদরা বলেছেন—স্বেচ্ছা বিচ্ছিন্ন (Voluntary Isolate)। না, আপনি এদের সঙ্গে কিছুতেই আলাপ জমাতে পারবেন না। তিনি মনে করেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার যোগ্য শহরে হয়তো একজন বা দুজনই আছেন। এমনকি, ট্রেনে বিমানে তাঁর পাশে বসে গেলেও তিনি আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাবেন না।

বাংলায় এঁদেরই তথাকথিত আঁতেল বলা হয়। আমি নিজে আঁতেলদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছি।

তবে এই শ্রেণীর মানুষের আত্মবিশ্বাস খুবই বেশি। বিচ্ছিন্ন থাকতে তাঁরা গর্ব অনুভব করেন। তাঁরা গর্ব করে বলেন, আমি পাড়ায় কারও সঙ্গে মিশিনা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে না মিশলেও তাঁদের কিছু এসে যায়না। তাঁরা জানেন, তাঁদের যে দুচারজন সমগোত্রীয় বন্ধু আছেন, তাঁরা ভীষণ প্রভাবশালী। সুতরাং তাঁদের চাকরি পাবলিসিটি পুরাকার এ সবই নির্ভর করে ওই গুটিকয়েক লোকের ওপর। জনগণের সমর্থনের উপর তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করেনা বলে তাঁরা জনগণকে তোয়াক্কা করেননা। কিন্তু সাধারণ মানুষকে নির্ভর করতে হয় সামাজিক সুনামের ওপর। সকলে চান সবাই তাঁকে পছন্দ করুক। সবাই তাঁকে ভালবাসুক কিন্তু তিনি সবাইকে ভালবাসার গ্যারান্টি দিতে পারেন না। এটাই মানুষের ধর্ম। এমনকি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে দরজা বন্ধ করে বসে আছে, সামাজিকতার ধার ধারছেনা,

সেও ভাবছে তা সত্ত্বেও জনগণ তাকে খাতির করবে। অবশ্য জনপ্রিয়তা হারাবার ভয় তিনি করেন না। জনসাধারণ তাঁর বিরূপ সমালোচনা করলে তিনি বিচলিত বোধ করেননা।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারাবার ভয় সবসময় থেকেই যায়। সামাজিকতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যও তিন রকম। এক, সকলের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। বিচ্ছিন্নতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও দুই সকলের সঙ্গে মিশে ভাবের আদান প্রদান করে মানসিক শান্তি পাওয়া। তৃতীয় কারণ হল, অপরের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক তৈরি করে তাকে পটিয়ে পটিয়ে নিজেদের আখের গোছানো। অর্থাৎ এককথায় কার্যসিদ্ধি করা। কিন্তু সাধারণ লোকের মনে সব সময় ভয় হয় পাছে লোকে কিছু বলে। এই বুঝি জনপ্রিয়তা হারালাম। পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকখানিই পারস্পরিক স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুটা দাঁড়ায় ভাবাবেগের উপরেও। প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক ভাবাবেগের সম্পর্ক ভাবাবেগ যত দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বও তত দীর্ঘস্থায়ী। আবার ভাবাবেগকে ছাড়িয়ে স্থূল সম্পর্ক তৈরি হলেও সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেমন দুই বন্ধু পরস্পরকে বৈষয়িক সাহায্য করলে সে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়, নরনারীর সম্পর্ক যদি যৌন সম্পর্কে পরিণত হয় তাহলে সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়—কারণ এর ফলে পারস্পরিক আকর্ষণও তীব্র হয়।

কিন্তু সমস্ত সম্পর্কই ভেঙে যেতে পারে, এমনকি মায়ের সঙ্গে সন্তানের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাবা ছেলেকে ত্যজ্য পুত্র করে দেন। কিশোর বয়সে ছেলেমেয়ে বাড়ি থেকে চলে যায়, আর ফেরেনা। আমার জীবনে একাধিক প্রাণের বন্ধু আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনারও নিশ্চয়ই এমন হয়েছে, অফিসের কোনও সহকর্মী তার নিজের সুবিধার জন্য আপনার বসের কাছে গিয়ে আপনার সম্পর্কে সত্যমিথ্যা নানা কথা লাগিয়ে এসেছেন। পরিণামে আপনার প্রমোশনের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

এমন হয়েছে সামান্য ভুলবোঝাবুঝির ফলে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছে। কাজেই যারা জনপ্রিয়তাকে মূল্য দেন, তাঁদের বেশি করে সামাজিক হতে হয়। এইজন্য দেখবেন ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ শ্রেণী বেশি সামাজিক। কারণ তারা যত সামাজিক হবেন ততই তাঁদের সুবিধা। ব্যবসায়ী শ্রেণী বেশি করে ক্লাবের সদস্য হন, গুরুর শিষ্য হন। এতে করে তাঁদের সম্পর্ক বিস্তারিত হয়। পাড়ার উকিল ও ডাক্তাররা অধ্যাপক ও শিক্ষকদের তুলনায় বেশি সামাজিক। অনেক লোক আছেন যাঁরা যেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা সেখানে অসামাজিক। কিন্তু নিজেদের গ্রুপের মধ্যে সামাজিক। পেশাদার লোকেদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়না, কিন্তু তাঁদের সমপেশার লোকজনের সঙ্গে খাতির রাখতে হয়—পেশাদারি সুবিধার জন্য। তাই

ইঞ্জিনিয়র শ্রেণীর ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশেন না, তাঁদের পাত্তা দেন না। কিন্তু তাদের সোসাইটিতে তাঁরা মেশেন।

তাই একজন মিশুক ও অমিশুক লোককে দেখলে চুলচেরা বিচার করতে হবে সত্যিই কি তিনি অমিশুক না শুধু আপনার সঙ্গেই মিশছেন না। অহংকারি বলে যাকে মনে করছেন, তিনি হয়তো তার নিজের গোষ্ঠীর কাছে ভীষণ মিশুক। আপনাকে তিনি পাত্তা দিচ্ছেন না, কারণ আপনাকে তিনি হয়তো ভয় পান, সমীহ করেন, উপযুক্ত মনে করেন না বা ঘৃণা করেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে বদনাম দেওয়াটা ঠিক উচিত হবেনা। অনেকে বলেন, জ্যোতিবাবু নাকি একদম হাসেন না, তিনি খুব উদ্ধত। কিন্তু তিনি তাঁর নাতনিদের সঙ্গে হাসেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করেন। তিনি তাঁর স্তরের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে হে হে করার তাঁর আজ আর প্রয়োজন নেই। তাদের যা বলার তা তিনি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মঞ্চ থেকেই বলেন।

তাছাড়া মানুষের মৌলিক চরিত্রের খুব অদলবদল হয়না। শুধু অগ্রাধিকারের পরিবর্তন ঘটে মাত্র। ছেলেবেলা থেকে যদি কেউ মানসিক অবসাদে ভোগেন ও তার ফলে একাকীত্ব অনুভব করেন, তাহলে পরিণত বয়সেও তিনি সুযোগ পেলেই একা থাকার চেষ্টা করবেন না। তাঁর মধ্যে কথাবার্তায় লঘুত্ব বা চাপল্য দেখা যাবেনা। কিন্তু একসময় যিনি প্রয়োজনের খাতিরে সকলের সঙ্গে মিশতেন, সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তিনি গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে বন্দী করে থাকেন। এটাই জীবনের ধর্ম।

ওপর চালাক মানুষ ঃ বাংলায় একটি শব্দ আছে 'ওপর চালাক'। এর মানে হল আপাত দৃষ্টিতে লোককে বোঝানোর চেষ্টা করা যে তার স্মার্টনেস ও বুদ্ধি খুব বেশি। কিন্তু আসলে সে বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনই নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করেনা। আচরণে সংযম ও আচারে সুশৃঙ্খলাই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

যাঁদের বুদ্ধি অপরিণত তাঁরা সব ব্যাপারেই সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলেন। মনের ভাব প্রকাশের নামই ভাষা। কিন্তু ভাষা দিয়েই আবার মনের ভাব গোপন করতে হয়।

ধরুন নেমন্তন্ন বাড়িতে আপনি খেতে গেছেন। রান্না খুব খারাপ হয়েছে। মাছের কালিয়া অত্যন্ত ঝাল, মাংস লবণে পোড়া, দই ভাল করে বসেনি। লুচি কাঁচা রয়েছে, ভাল ভাজা হয়নি, চাটনিতে প্রচণ্ড মিষ্টি পড়েছে। এমন ঘটনা আকছার হচ্ছে। কিন্তু গৃহস্বামী যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেমন রান্না হয়েছে ? আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করে বলেন ঃ খুব বাজে। তাহলে সেটি খুবই খারাপ

শোনাবে। লোকের ধারণা হবে আপনি খুব বোকা। এখানে স্পষ্টকথা বলা বোকামি। আসল বুদ্ধির পরিচয় মনের ভাব গোপন করে বলা—খুব ভাল রান্না হয়েছে। সকলের সামনে গৃহকর্তাকে অপ্রস্তুত করা উচিত নয়।

কিন্তু আবার এই আপনি যদি বিধানসভার সদস্য হন, তাহলে কোনও মন্ত্রী সম্পর্কে যদি আপনি কিছু গোপন তথ্য পেয়ে যান, তাহলে তাঁর মুখের ওপর সে কথা বলাই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

অনেক লোক আছেন যাঁরা মনের ভাব গোপন করতে না পেরে অনেক অশোভন কথাও বলে ফেলেন। যেমন অনেকে অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখাহলে হয়তো বলেন, খুব মোটা হয়ে গেছ। অনেকে কথার মধ্যে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ প্রয়োগ করেন।

কয়েকবছর আগে এক সাহিত্য পুরস্কার সভার বিচারকদের সভায় যোগ দিতে গিয়েছি। আমার তখন বছর পঞ্চাশ বয়স, সবে একটি বাড়ি করেছি। সে কথা শুনে এক অধ্যাপক সকলের সামনে বলে উঠলেন, এই বয়সে বাড়ি করে ফেলেছেন ? কথাটা শুনে খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। ভদ্রলোক হয়তো ইঙ্গিত দিচ্ছেন আমি চুরি করে বাড়ি করেছি। তা নাহলে এই বয়সে কী করে বাড়ি করতে পারলাম। অথচ তিনি কিছু ভেবে বলেননি হয়তো। কিন্তু মুখের ওপর একথা না বললেই পারতেন।

বয়স্কদের অনেকে কারও সঙ্গে আলাপ হলে তার বেতন জানতে চান।

আবার অনেকে সুন্দরী মহিলাদের দেখেও তাঁদের ভাবাবেগ চাপতে পারেন না। কেউ প্রকাশ্যে অপরিচিতাকে বলেই ফেলেন, আপনাকে খুবই সুন্দর দেখতে। কিন্তু এই সামান্য অকপট স্বীকারোক্তিকে অনেক মহিলা বেআদপি বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু পার্টিতে যখন পুরুষ মহিলা সাজগোজ করে আসেন এবং হাল্কা মেজাজে থাকেন তখন অপরিচিত মহিলার সঙ্গে প্রথম আলাপেই এই কথা বললে তিনি সেটি উপভোগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন ধন্যবাদ।

সুষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবাবেগ ব্যক্ত করেন না। আবার তিনি তাঁর মনোভাব চিরকালের জন্য চেপে রেখে অবদমনের শিকার হন না, স্থানকালপাত্র মেনে তবেই তিনি মনোভাব ব্যক্ত করেন।

বুদ্ধিজীবীরা কম কথা বলেন এবং সকলের সঙ্গে মেশেন না। কারণ তাঁরা জানেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই কতগুলি ভাবাবেগ প্রকাশ করতে হবে। এই ভাবাবেগগুলি অর্থাৎ তাঁর প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। অনর্থক বেনা বনে মুক্তো ছড়াবার তাঁরা বিরোধী। তাঁরা সমমর্মী মানুষের কাছেই কিন্তু মুখ খোলেন। অশিক্ষিত মস্তান শ্রেণীর লোকেরা প্রকাশ্যে পরস্পরের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা বলে। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা কি মুখখিস্তি করেন না না সেক্স নিয়ে চর্চা করেন না ? নিশ্চয়ই করেন।

কারণ সেক্স এর প্রতি আগ্রহ মানুষের সহজাত ধর্ম। এমনকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত পণ্ডিত ব্যক্তিও খিস্তি করতেন শুনেছি। কিন্তু তাঁরা নিজেদের সার্কেলে খুব সীমিত লোকের মধ্যেই খিস্তি খেউড় ও যৌন রসিকতা করতেন। কোথায় কখন কি বলতে হবে আর চেপে যেতে হবে এটি বোঝার মত ক্ষমতাই ব্যক্তিত্ব ও বৈদগ্ধ্য।

বিদগ্ধ ব্যক্তি যদি বোঝেন যে তাঁর অকপট আচরণের বা উক্তির দ্বারা অন্যান্য মূল্যবোধ আহত হতে পারে তাহলে তিনি সেখানে চুপচাপ থাকবেন। তিনি কখনও কিছু বলে বোকা বনতে রাজি হবেন না অথবা বোকার মতও কথা বলবেন না।

যারা বেশি কথা বলে তারা সবাই যে বাচাল আখ্যা পায় তা নয়—তাদের মিশুকে বলে নাম ডাকও হয়। কিন্তু কথা বলারও একটা আর্ট আছে। সেই আর্ট রপ্ত করতে না পারলে লোকে বেশি কথা শুনতে চাইবেনা। আমরা লোকের কথা তখনই শুনব যদি দেখি সেই কথার মধ্যে কিছু না কিছু সার বস্তু আছে। অর্থাৎ তা থেকে কোনও নতুন খবর পাওয়া যাচ্ছে বা কৌতূহলের নিবৃত্তি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত যে বলছে তার উচ্চারণ যেন স্পষ্ট হয় এবং বলার ভংগি যথেষ্ট সরস হয়।

আমাদের একজন সহকর্মী ছিলেন। খুব স্মার্ট। সবসময় স্যুটেড বুটেড থাকতেন। তিনি ছিলেন আমাদের বিমান ঘাঁটির রিপোর্টার। দারুণ দারুণ তাঁর অভিজ্ঞতা। লোকে তাঁর কথা শুনতে চাইত। কিন্তু যেই তিনি কথা শুরু করতেন অমনি লোকেরা হাই তুলত। একটি সরস অভিজ্ঞতাকে বিরসতমভাবে উপস্থিত করতেন তিনি। তাছাড়া তাঁর উচ্চারণ জড়িয়ে যেত। আমি যত বক্তৃতা শুনতে যাই তার মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের বক্তৃতাই নীরস লাগে। তার কারণ তাঁরা বক্তব্য বিষয় সরস করে গুছিয়ে বলতে পারেন না। তাছাড়া তাঁদের উচ্চারণের মধ্যেও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করতে হয়। কোন বর্ণের উপর জোর পড়বে, শ্বাসাঘাত পড়বে সেটি দেখতে হয়। শ্রোতা যেন কিছু মিস না করেন। তিনি একবার মাত্র শুনছেন। এইসব কথা মনে রাখতে হয়।

বিদগ্ধ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কথায় আবার ফিরে আসি।

মনে রাখতে হবে ভাবাবেগ গোপন করা মানে ভাবাবেগ অবদমিত করা নয়। ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা। ভাবাবেগের ব্রেকটি থাকবে নিজের হাতে। যেখানে চুপচাপ থাকার দরকার সেখানে চুপচাপ, যেখানে ভাবাবেগ প্রকাশ করার দরকার সেখানে তা প্রকাশ করতে হবে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য সমস্ত কিছু নিয়েই মানুষ। কোনটাই অবদমন করার দরকার নেই। কিন্তু কোনও নারীকে দেখে কামনা জাগলেই তাকে রেপ করার জন্য ছুটে যেতে হবে? অথবা তাকে টিজ করতে হবে?

আবার কামনা প্রকাশের যে ক্ষেত্র অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন, সেখানে যদি কেউ কামনা প্রকাশ না করে কা তব কান্তা বলে মোহমুদ্গর পাঠ করেন, তাহলে বুঝতে

হবে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন। কামশীতলতা এক মারাত্মক অসুখ যা কামুকতার মত সমান পরিত্যজ্য। দৈনন্দিন জীবনে সাংসারিক নানা চাপের মধ্যে হাসির অবকাশ খুবই কম। কিন্তু কেউ যদি রসিকতা শুনে না হাসতে পারেন তাহলে বুঝতে হয় তাঁর রসবোধের ঘাটতি আছে। সূক্ষ্ম রসিকতা বেশিরভাগ লোকই ধরতে পারেননা। কিন্তু মোটা দাগের রসিকতা সবাইকে আকৃষ্ট করে। অথচ বিদগ্ধ ব্যক্তি বহু অপরিচিত লোকের সামনে মোটা দাগের রসিকতা করবেন না। অনেকে রসিক সেজে চটকরে মানুষের মন জয় করার জন্য মোটা দাগের রসিকতা করেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত ভাঁড় বলে পরিচিত হন। এমন অনেক ওপর চালাক 'ভাঁড়' কে আপনারা বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই দেখে থাকবেন। শস্তায় জনপ্রিয় হওয়ার জন্য এঁরা এমন সব আচরণ করেন যা দেখে সবাই মুখ টিপে হাসে। তবে ভাঁড় বা বিদূষক ধরণের মানুষকে লোকে শ্রদ্ধা না করেও তাদের মূল্যে লোকে উপভোগ করে। সেজন্য এইসব লোকদের একটা সস্তা জনপ্রিয়তা থেকেই যায়। সার্কাসের ক্লাউনরা বীভৎস দেখতে। তারা মোটা দাগের ভাঁড়ামো করে। কিন্তু বাচ্চারা এই ক্লাউনদেরই পছন্দ করে। বড়লোকেরাও বিদূষকদের পছন্দ করে এবং বড়লোক, জমিদার রাজা মহারাজাদের দরবারে ভাঁডদের বেতন দিয়ে পোষা হয়।

ভাবাবেগ চাপতে গিয়ে বহুলোকের যে রিপ্রেসন হয়ে যায় সেকথা আগেই বলেছি। বেশিরভাগ লোকই সব ভাবাবেগ দীর্ঘকাল চেপে রেখে সুস্থ থাকতে পারেন না।

যেমন একটি চৌবাচ্চায় একটি নল দিয়ে জল ঢুকছে। আর একটি নল দিয়ে যদি জল বারকরে না দেন তাহলে চৌবাচ্চাটা ছাপিয়ে জল পড়ে যাবে। অথবা জলের তোড় থাকলে এবং জল বার করে না দিলে জলাধারটাই ফেটে যাবে।

সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভাবাবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করলে অবদমনে ভোগেন। তাঁর চিন্তায় ব্যবহারে মানসিক বৈকল্য দেখা যায়। তিনি নিউরোটিক রোগী হয়ে যান। অফিসে কোনও কর্মচারী দিনের পর দিন বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, অথচ তিনি প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না তাঁর মধ্যে মানসিক নানা অসুখ দেখা দেবে। গভীর শোকে কাঁদতে পারছেন না—তিনি পাগল হয়ে যাবেন। হাসি আসছে, অথচ শালীনতার জন্য জোরে জোরে হাসতে পারছেন না—এতেও শরীরের ভেতর শুরু হবে নানা প্রতিক্রিয়া।

সেজন্য মনস্তত্ত্ববিদরা বলছেন, যদি দেখেন দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনমত ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কারও শরীর ও মনের ওপর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি তাহলেই বুঝবেন তাঁর ব্যক্তিত্ব নিখুঁতভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। কারণ ভাবাবেগ প্রকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলেই কর্মজীবন দাম্পত্য জীবন ছারখার হয়ে যায়। সম্মানহানি ঘটে, আত্মসম্মান বোধটুকু পর্যন্ত থাকেনা।

তাহলে ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সমূহ বিপদ আবার ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলেও অবদমনজনিত নানা মানসিক অসুখ ও স্ট্রেসের সম্ভাবনা। এই দুই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে মাথা ঠিক রাখাই দুরূহ। এজন্য এমন কতগুলি উপায় বার করতে হয় যাতে করে ভাবাবেগ বশে থাকে। যার সাংসারিক জীবন যাত্রা যত স্বাভাবিক হবে তাঁর ভাবাবেগ বশে রাখার ক্ষমতা তত বেশি হবে।

একজন বিবাহিত ব্যক্তি একজন অবিবাহিত ব্যক্তির চেয়ে কামনাকে অনেক বেশি সংযত রাখতে পারেন। অবশ্য এটি নির্ভর করে ওই বিবাহিত বক্তির যৌন জীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক কিনা তার ওপর। তাঁকে উভয়ে যদি যৌন মিলনে তৃপ্ত হন তাহলে দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন যৌন উদ্দীপক (হিন্দি ছবি, অশ্লীল পোস্টার, পর্ণোগ্রাফি, পথে ঘাটে স্বল্পবাসা মহিলা, যৌন স্বাধীনতাবাদী নারী পুরুষের নিভৃত সঙ্গ, যৌন উত্তেজনাকর নানা আকার ইঙ্গিত) তাঁর ভাবাবেগকে প্রভাবিত করতে পারবেনা।

এছাড়া স্ট্রেস মুক্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাত্রার জন্য চাই জীবনচর্যায় একটা শৃঙ্খলা। একটি মানুষের দৈনন্দিন কর্মসূচি থেকে আপনি মানুষটির চরিত্র বুঝতে পারবেন। অলস কুঁড়ে ও দুর্বল প্রকৃতির লোকেরা মানসিকভাবেও ভীষণ দুর্বল ও যে কোনও মানসিক প্রলোভনের শিকার।

যদি কাউকে দেখেন সারাদিন গুরুতর কায়িক শ্রম করেন—অর্থাৎ হয় পরিশ্রম সাধ্য কাজ নয়তো প্রতিদিন নিয়মিত খেলাধূলা বা ব্যায়াম করেন, হো হো করে দিনের মধ্যে বার কয়েক হাসেন, নিয়মিত স্ত্রী সহবাস করেন এবং গভীর শোকে শিশুরমত কাঁদেন তিনি একজন যোগীর মতই সংযমী বলে গণ্য হতে পারেন। কারণ কোনও স্ট্রেস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা।

মনের কথা বন্ধুবান্ধবদের কাছে খুলে বলাতে মানসিকভাবে একটা 'ক্যাথারসিস' হয়। এর ফলে ভাবাবেগ মনের মধ্যে গ্লানি হয়ে জমতে পারেনা। যে সব ছেলেমেয়ে ছেলেবেলা থেকে প্রিয় বন্ধু পেয়েছে তাদের মানসিক গঠন নিঃসঙ্গ ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ হয়।

তরুণতরুণীরা তাদের প্রেম, প্রাক বিবাহ ও যৌন জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনার মত উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পায়না। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন 'টার্গেট পার্সেন'। বিদেশে এজন্য মনস্তত্ত্ববিদ বা মনঃসমীক্ষকরা এই টার্গেট পার্সন হন। আমাদের দেশে 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' এর ধ্যান ধারণা এখনও প্রাথমিকস্তরে। যদি এমন কোনও বিশেষজ্ঞ থাকেন যিনি আধ্যাত্মিক গুরুও নন আবার পেশাদার মানসিক রোগের চিকিৎসকও নন, যাঁরা দরদী কাউনসেলার বা পরামর্শদাতা, যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বুদ্ধি বিদ্যা এবং সহানুভূতি দিয়ে সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ জনিত নানা সমস্যার সমাধান করবেন, তাঁরা সমাজের এক বিরাট উপকার সাধন করবেন।

উপসংহার

আমাকে যদি সবার শেষে কেউ প্রশ্ন করেন, এই যে মানুষ চেনা নিয়ে আপনি এতদিন ধরে এত লেকচার দিলেন, আপনি নিজে কি মানুষ চিনেছেন ?

আমি বলব অনন্ত জ্ঞানশাস্ত্রের যেমন শেষ নেই, তেমনি মানুষ চেনারও শেষ নেই। এক একটি লোক এক একটি লোক থেকে আলাদা। চিনতে গেলে পৃথিবীর ৫০০ কোটি লোকের সঙ্গে সারাজীবন ধরে মিশতে হবে। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো যেমন পাপ, তেমনি মানুষকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করাটাও অন্যায়। সরল বিশ্বাস বস্তুটা বোকামির লক্ষণ। বিশ্বাসের মধ্যেও কিছুটা Scepticism রাখতে হবে। ধরুন, আপনার এক অতি বিশ্বাসী বন্ধুকে অসময়ে টাকা ধার দিয়েছেন। টাকাটা তিনি ফেরৎ দেবেন এটা যেমন বিশ্বাস আছে তেমনি একটি ক্ষীণ অবিশ্বাসও রাখতে হবে যে টাকাটা নাও পেতে পারেন। এক্ষেত্রে টাকা যখন দিলেন তখন সেই না পাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই আপনি দিচ্ছেন।

আমি এসব কথাগুলো বলছি তার কারণ মনুষ্যচরিত্র (স্ত্রীচরিত্র বলে শুধু মেয়েদেরই দোষ দিতে চাইনা) দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। আমরা যারা মানুষের মন নিয়ে কারবার করি তারা বলতে পারি কে কোন টাইপের মানুষ। কিন্তু মনের অতলে ডুবুরি নামাবার ক্ষমতা আমাদের নেই যদি না কেউ আমাদের কাছে এসে নানা ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

মানুষকে চেনা এত সহজ নয় এই কারণে যে মানুষের চিন্তাধারা দ্রুত বদলায়। আজ আপনি যাকে সৎ বলে জানছেন, কাল সে অসৎ হয়ে যেতে পারে। প্রলোভনের মুখে যতক্ষণ কেউ না পড়ছে ততক্ষণ সে সৎ থাকে। রামকৃষ্ণদেব কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করতে বলে গেছেন। কারণ কামিনী কাঞ্চনে প্রলোভন আসে। যেসব চাকরিতে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ নেই, সেসব চাকরি যাঁরা করেন তাঁরা মোটামুটি সৎ থাকেন। কারণ অসাধু হওয়ার সুযোগ তাঁদের নেই বললেই চলে। কিন্তু পুলিশের চাকরি, শুল্ক বিভাগে চাকরি, পুরসভার চাকরি, লাইসেন্স পারমিট দেওয়ার চাকরি, পারচেজের চাকরিতে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ খুবই বেশি। এখানে কেউ যদি ঘুয না খান, তাহলে তাঁকে সত্যিকারের সৎ বলা যায়। এমন লোক যে নেই তা নয়, আমি অনেককে দেখেছি। তবে তাঁরা সংখ্যায় কম। এমনও দেখেছি ট্রাফিক পুলিশে একজন অফিসার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছেন তাঁকে ট্রাফিক গার্ডের ওসি না করে পরিসংখ্যান দফতরের ওসি করা হোক। কারণ ট্রাফিকগার্ডে প্রচুর ঘুষ। সেখানে তিনি ভীষণ প্রলোভনের মুখে পড়বেন। আর পরিসংখ্যান বিভাগে পয়সা নেই। তাই তিনি সেখানে যেতে চান। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, হাওড়া শিয়ালদা স্টেশান, বড় বড় থানায় বদলি হওয়ার জন্য নীলামে ডাক হয়। যে অফিসার ডেকে নেবেন তাঁকে সেখানে

পাঠানো হবে। এরজন্য তিনি যা খরচ করবেন, দুগুণ উশুল করবেন। আমার এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে হয় এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। পদমর্যাদায় সে ছিল এ এস আই। বিয়ের সময় ট্রেনিং চলছিল। ট্রেনিং এর পর পোস্টিং এর সময় বউ এর মাধ্যমে শ্বশুরকে এবং শ্বশুরের মাধ্যমে আমাকে ধরল তাকে বড়বাজার থানায় প্রথম পোস্টিং দিতে। কারণ ওখানে নাকি সবচেয়ে বেশি টাকা। এখন এই সব ছেলেদের প্রথম থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে তাদের টাকার প্রতি প্রচণ্ড লোভ। তারা দুর্নীতি করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু খুব সৎ চরিত্রবান একটি ছেলেকে জানতাম সে শুল্ক দারোগা হয়ে নষ্ট হয়ে গেল।

এমন জায়গায় চাকরি পেল যেখানে প্রচুর টাকার প্রলোভন। কাঁচাটাকা বড় আপদ। প্রথমে ওই টাকায় লোকে মদ খেতে শেখে। মদ আর রেস্টুরেন্টে পেটপুরে তেল ঘি এর খাবার আর চর্বিযুক্ত মাংস খেতে শুরু করে। বছরখানেকের মধ্যে ঘুষখোর ও দুর্নীতিপরায়ণদের একটা বিশেষ ধরনের চেহারা হয়ে যায়। প্রচণ্ড মেদ জমিয়ে ফেলে তারা। বয়স হলে ক্লোরেস্টরেল বাড়ে। চোখের নিচে চর্বি জমে। মদ আর খাওয়াদাওয়া রাত না হলে জমেনা। রাত্রি জাগরণের ফলে তাদের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়ে। এরপর অনেকে বারবধূর সন্ধান করে। তাদের পিছনে টাকা ওড়ায়। শেয়ারে, জুয়ায়, রেসে অনেক টাকা ওড়ায়। বাড়ি তৈরি করে, ভিসিআর ভিসিপি কেনে। অন্যের নামে গাড়ি কিনে সেই গাড়ি ভাড়া খাটায়। ঘুষের টাকায় বড়লোক হলে শত্রুও বাড়তে থাকে। অফিসে শত্রু বাড়ে। যারা ঘুষ দেয় তারাই আবার গর্ব করে বলে বেড়ায় অমুক অফিসারকে অত টাকা দিয়ে এলাম। এতে পাড়াপড়শীরা জানতে পারে লোকটি দুনম্বর করে। কিন্তু টাকা হাতে আছে বলে চটায় না। কিন্তু ইনকামট্যাক্স, চোরডাকাত ও মস্তানদের ভয়ে লোকটি সিঁটিয়ে থাকে।

আমি যার কথা বলছি সেই ছেলেটি সব স্বীকার করে আমায় চিঠি লেখে—স্যার, সবাই এখানে দুহাতে টাকা নিচ্ছে। আমিও নিচ্ছি। এই ছেলেটি শুল্ক বিভাগে না গিয়ে যদি অধ্যাপনায় যেত তাহলে সেখানে ঘুষ খাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠত না। কারণ অধ্যাপনায় ঘুষের সুযোগ নেই। দুধরণের লোভী মানুষ আছে। এক যারা জন্ম থেকেই লোভী। আর এক যারা পরিবেশের চাপে বা সঙ্গদোষে লোভী।

যারা জন্ম থেকে লোভী তারা ছেলেবেলা থেকে লোভের পরিচয় দেয়। ছেলেবেলা থেকে এটা ওটা চুরি করা তাদের স্বভাব। আমি ছেলেবেলায় দেখতাম আমাদের কিছু সহপাঠী ট্রেণের আলোর বাল্ব খুলে সেগুলি চোরাবাজারে বিক্রি করত। এরা কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে জীবন সংগ্রামে অভ্যস্ত হতে পারেনা। আমার এক আত্মীয় আমার নাম করে মিথ্যা কথা বলে লোকের কাছে টাকা চাইত। তারপর সেই টাকায় ফুর্তি করত। আমি তাকে হাতের কাজ শেখাবার জন্য একটি পলিটেকনিকে ভর্তি করে দিলাম। সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে চোরাই মাল বিক্রি করে বেশি টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখল। আমি যখন সীমান্ত জেলাগুলিতে যাই তখন দেখি মোটরসাইকেল নিয়ে এক একটি

মস্তান দল গজিয়ে উঠেছে। যারা এপার ওপার মাল পাচার করে বহু টাকা রোজগার করে। চোরাই চালান পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলায় একটা সমান্তরাল শিল্প। শিয়ালদা স্টেশনে অনেক রাতের ট্রেনে কত মেয়ে বাড়ি ফিরছে। রাতের বাসে কত মহিলা ফিরছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেহ বিক্রি করে পয়সা রোজগার করে। কিন্তু সবাই টাকার জন্য যে এই পথে নামে তা নয়।আমি সুদূর আন্দামানে গিয়ে দেখেছি কলকাতার কত বেকার তরুণ, জাহাজে করে মাল নিয়ে গিয়ে ডিগলিপুর বাজারে বিক্রি করছেন। কেউ যাচ্ছেন লিটল আন্দামান কেউ ক্যাম্বেল বে—কি নিদারুণ পরিশ্রম। একবার ভাবুন যে হকারটি এই ভিড়ের ট্রেণে কাঁধে বিরাট ভারি সফট ড্রিঙ্কের টিন নিয়ে বিক্রি করছে। কত টাকা তারা রোজগার করে প্রতিদিন ? দিনে বড়জোর পঞ্চাশ টাকা। স্মাগলিংএ দিনে পাঁচশ থেকে হাজার আয়। তবে সবাই স্মাগলিং করেনা কেন ? যে মেয়েটি রাতদিন সেলাই করে সে মাত্র দশ টাকা রোজগার করে। তবে সে অন্যপথে যাচ্ছেনা কেন ? এর কারণ সবারতো যেন তেন প্রকারেণ অর্থের প্রতি লোভ থাকেনা। কাজেই তারা সৎপথে থেকে প্রচুর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে। মানুষ হিসাবে এরা উচ্চস্তরের। তবে এই মানুষেরই আবার পরিবেশের গুণে স্বর্গ থেকে পতন হতে পারে। একবার প্রলোভনের মধ্যে গিয়ে পড়লে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। নেশা করতে বারণ করা হয় কেন ? না একবার নেশার প্রলোভনে পড়লে অধিকাংশ মানুষ সীমারেখা রাখতে পারেনা। আপনি যদি রোজ এক পেগ করে ব্রান্ডি কিংবা হুইস্কি খান এবং আপনার শরীর যদি সুস্থ স্বাভাবিক থাকে এবং আপনার যদি পয়সা কড়ির অভাব না থাকে, তাহলে ডাক্তাররা বলেন, এটি আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

দেখলি গা-ম্যাজমেজে ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে

কিন্তু এক পেগের মধ্যে ড্রিঙ্ক সীমাবদ্ধ রাখা খুবই কঠিন। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন। তিন থেকে চার—এইভাবে আপনার নেশা বেড়েই চলবে। তাছাড়া যেদিনই খাবেন না সেদিন গা ম্যাজ ম্যাজ করবে। এইজন্যে ও পথের পথিক না হওয়াই ভাল। কিন্তু বহু ভাল ভাল ছেলে এমন চাকরিতে ঢুকেছেন যেখানে মদ খাওয়াটা সংস্কৃতির লক্ষণ। তাঁরা মদের ফাঁদে পা দিয়ে মদ্যপ হয়ে গিয়েছেন। সেদিন দেখি একটি ছেলে মদ খেয়ে তার সৌম্য একহারা চেহারাটিকে নষ্ট করে ফেলেছে। অথচ এই ছেলেটিকে খুব বাচ্চাবয়স থেকে জানতাম, কথাবার্তা কম বলত। সংযমী, পরিশ্রমী। দেখে মনে হল, ছেলেটি শিগ্রি লিভারের অসুখে পড়বে।

সশস্ত্র বাহিনীতে মদ অর্দ্ধেক দামে পাওয়া যায়। বিনাপয়সাতেও মদের ছড়াছড়ি। সিগারেট কিনতেও আর্মির লোকদের শুল্ক লাগেনা। এর ফলে মদ্যপানকে বা ধূমপানকে সেখানে উৎসাহ দেওয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বহু অফিসার ও জওয়ান মদ স্পর্শ করেন না। এঁদের চরিত্রবল প্রশংসা করার মত। সিনেমা লাইনে একটা পারমিসিভ সমাজ গড়ে উঠেছে।

সাধারণের কাছে যে যে আচরণ দৃষ্টিকটু, সিনেমার নটনটীদের জীবনে তা শুধু স্বাভাবিক নয় বরং গৌরবের। একাধিক বিয়ে, ডিভোর্স, বিয়ে না করে একত্র বসবাস, মদ্যপান, জুয়ো, রেস, আয়কর ফাঁকি দেওয়া, কালোটাকা করা এ লাইনে কৃতিত্বের। এমনকি ফৌজদারি অপরাধ করলেও জনপ্রিয় তারকাদের ক্ষেত্রে সাতখুন মাপ।

কিন্তু এর মাঝেও সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে বহুলোক চিত্রজগতে আছেন যাঁরা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। মদ খাননা এবং তাঁদের চরিত্র নিয়ে কোনও বদনাম নেই।

একনজরে মানুষ চেনার জন্য সর্বাগ্রে দেখে নিন

১. কোনও মানুষের ব্যবহারে পূর্বাপর সঙ্গতি আছে কিনা। স্বার্থ থাকলে বহু বড় বড় মানুষও সামান্য মানুষের কাছে নতজানু হয়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন। আপনার চেয়ে সবদিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন যিনি, বিনা স্বার্থে তিনি আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন। ভোটের সময় প্রার্থীরা গরিব কৃষক মজুরদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সুখ দুঃখের খোঁজ নেন, কিন্তু ভোট শেষ হয়ে গেলে চিনতে পারেন না এমন ব্যক্তি অত্যন্ত কপট ও ধূর্ত।

২. আপনার সহকর্মী, অন্তরঙ্গ বন্ধু বা বহুদিনের পরিচিত কোনও ব্যক্তি

এমনপদে চলে গেলেন যেখান থেকে অনুগ্রহ বণ্টনের সুযোগ আছে যথেষ্ট। আপনি তাঁর কাছে পুরনো পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে দেখা করতে গেলে যদি দেখেন তাঁর ব্যবহার একদম বদলে গেছে বুঝবেন, লোকটি কোনকালেই খাঁটি ছিলনা। এতদিন পরে পরীক্ষায় সেটি ধরাপড়ল।

৩. কোনও মানুষকে চট করে চিনতে গেলে দেখবেন সে কথা দিয়ে কথা রাখে কিনা। অধিকাংশ লোকই বাতকে বাত হিসাবে একটা কথা বলে দেয়, যেমন আমি অমুককে বলে দেব, ওটা করে দেব, আরে ওতো আমার বহুদিনের বন্ধু। কিন্তু পরে প্রয়োজনের সময় আর তাকে পাওয়া যায়না। তাই ছেঁদো কথায় ভুলবেন না। কে মাল পৌঁছে দিতে পারে তার নিরিখেই বিচার করুন মানুষকে।

৪. মানুষের মন পদ্মপাতায় জল। তাই কারও কথা পুরোপুরি বিশ্বাসও করবেন না, অবিশ্বাসও করবেন না। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রাণের বন্ধুকেও বিশ্বাস করবেন না। সব কিছু লিখিত পড়িত চুক্তি করে নেবেন। **আজ যদি কেউ আপনাকে বলে, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার সঙ্গে আমার জীবনে বিচ্ছেদ হবেনা—একথা শুনে মনে মনে হাসবেন। বহু দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং সুগভীর প্রেম পরবর্তীকালে অতি সামান্য কারণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে কোনও সম্পর্কই স্থায়ী নয়।** আমি মা ছেলের সম্পর্কের মধ্যেও পরম বৈরীতা দেখেছি। আবার দেখেছি অনাত্মীয় মহিলাকে মা বলে তার পদবি পাতানো ছেলে গ্রহণ করেছে।

৫. কখনও নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেবেন না। নিজের জন্য কিছুটা অবশিষ্ট রাখবেন। বিদ্যাসাগর মশাইও নিজের বাড়ি ঘর দোর ব্যবসাপত্র সব রেখে তবে উদ্বৃত্ত অর্থ অকাতরে দান করেছেন। হর্ষবর্ধন যজ্ঞে সব কিছু দান করে কৌপীণ পরে প্রাসাদে ফিরেছেন। কিন্তু প্রাসাদে তাঁর আরও অনেক সেট পোশাক ছিল। যাকে ভাল বাসছেন সব সময় ভাববেন এ যদি চলেও যায় তাহলেও আমি বেঁচে থাকব। আপনাকে কেউ ভালবাসছে কিনা তা পরীক্ষা করার মন্ত্র হল ঃ

If you love somthing
Set it free.
If it comes back
It is yours
If it doesn't
It never was

যদি কাহাকেও ভালবাসো
তাহলে তার বন্ধন দশা নাশো
সে যদি আবার ফিরিয়া আসে
বুঝিও সে তোমারে ভালবাসে।